খুশীর আবেশ মেখে জীবন শোনান,—"লাঙলের ফলায় কর্ষিত মাটি/উর্বর হলে—বীজ।/বৃষ্টির আলিঙ্গনে/জীবনের অনন্ত প্রত্যুষে" [বোধ]—"আমি হাত বাড়ালেই/গোলাপ বাগানে বৃষ্টি নামে" [কাছাকাছি]। জীবনকে এমন করে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে ক'জন একথা বলতে পারে! তিনযুগ ধরে শহরবাসী হয়েও জীবন আসলে গ্রাম্য সরসতার জন্যেই শহুরে শুষ্কতা তাঁকে এখনো নির্জীব, নীরস, বিবর্ণ করে ফেলতে পারেনি। মধ্যবিত্ত জীবনের প্রাত্যহিক ঊষরতার ভেতর দাঁড়িয়েও তিনি অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারেন,—"সুখটুখ শব্দাবলী বৃষ্টির ফোঁটায় ফোঁটায়/গড়িয়ে গড়িয়ে সৃষ্টি করে মেঘ" [সুখটুখ শব্দাবলী]।—"যে কোন নদীর কাছে জানতে ইচ্ছে করে/জানতে ইচ্ছে করে নদীর পাড়ে কত বটগাছ আছে/কত ঘাট আছে" [কোন নদীর কাছে]। সেই বটগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিস্তৃত শস্যক্ষেত ও প্রান্তরের দিগন্তে ছোঁয়া নীল আকাশের হাতছানি তাঁকে মাটি মায়ের আড়ালে নিজের মায়ের মুখই দেখায়,—"বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে/আমি মায়ের মুখ দেখেছিলাম" [মেলা]।

এই আলোয় এই হাওয়ায় নিজের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের অনুরণন শুনে যে মানুষ নিজেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে প্রতি ধূলিকণাতেই আপনার অস্তিত্ব খুঁজে পায়, আত্মকেন্দ্রিকতা তার কোথাও নেই! সে দু হাত বাড়িয়ে সবাইকে কাছে টানে; আপন করতে চায়। ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক অন্ন তার কল্পনায় আসে না। একান্নবর্তী চিরন্তন বাঙালী সমাজ কাঠামোই তার আদর্শ। তার স্বপ্ন,—"একদিন হলুদ পাখি আসবে, বাসা বাঁধবে/ডাকবে কুটুম আয়···কুটুম আয়···/আমার বাগান ফুলে ফলে টইটম্বুর/একদিন মানুষের বাগান/তার স্বপ্নের মত/ছড়িয়ে যাবে পৃথিবীময়···" [স্বপ্ন]।

তবু বাস্তবকে ছেড়ে খুব বেশীদূর যাওয়া যায় না। জীবনের দুঃখ বেদনা যন্ত্রণা প্রতি পদক্ষেপে হোঁচটই সৃষ্টি করে। বাস্তব বড়ো নিষ্ঠুর। "···ইতিহাস শুধু সংখ্যাতত্ত্ব লিখে রাখে। অ-লিখন থাকে বড়ো গোপনতম দুঃখের ভাগ/যা নাকি মনের আগুনে জ্বলে, চোখের আগুনে পোড়ে।" (কেই সাড়া দেয় না)। স্বপ্ন হয়তো শেষ পর্যন্ত স্বপ্নই থেকে যায়—"স্বপ্নের মতো এই কাপাস তুলো/এখন ভেসে বেড়াচ্ছে/এখন কেবল অফিস ফেরৎ মুঠো মুঠো/ক্লান্তি নিয়ে স্বপ্ন খোঁজা/চাঁদের কিংবা মাটির (আমার

স্বপ্ন)। আধুনিক জীবনবোধের গভীর হতাশায় কবি আর্তি জানান,—"এই ভাবে আমার পাখি উড়ে যাবে/অন্য গাছে/আমার গাছ শীত হেমন্তে বুড়িয়ে যাবে/চলে যাবে দূরে সওদাগরের নৌকা, রেলগাড়ি···(আর্তি)।

৩২টি কবিতা নিয়ে আড়াই ফর্মার একটি কবিতার বইয়ের ভেতর কোন কবির সামগ্রিক চেতনাকে ধরা যায় না। আশা পোষণ অবশ্যই করা যায় জীবন আগামী দিনে কিছু সুসম্বদ্ধ ভালো কবিতার উপহার দেবেন। সুসম্বদ্ধ বললাম এই কারণে যে, সম্পাদনার কিছু ত্রুটি এই বইটিতে চোখে পড়ল। কয়েকটি কবিতা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত না করাই উচিত ছিল কারণ ইচ্ছার সব প্রকাশই কবিতা হয়ে ওঠে না। ছাপা, বাঁধাই ভালো। বেণু মিশ্রের আঁকা প্রচ্ছদটি সুন্দর।

—শিশির ভট্টাচার্য

এই আলোয় এই হাওয়ায়ঃ জীবন সরকার। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯। মূল্য চার টাকা।

৪

পৃথিবী নানা অশান্তিতে ভরে গেলেও কবির আত্মিক জগৎ সুন্দরের পূজা করে। কারণ কবি বা স্রষ্টা আশাহীন নয়। 'মঙ্গল আলপনা উঠোনময়' আঁকাতেই কবির আনন্দ—সুন্দর জগতের আরাধনা। জগতের মাঝে থেকেই শুরু হয় কবির বিশ্বকে দেখা। পৃথিবীর 'বক্ষদীর্ণ হাহাকারে'র মধ্যেও তিনি বেঁচে থাকতে চান। মনকে নানান 'প্রলোভন' থেকে সংযত করে আসেন প্রেমিকার কাছে। সেখানে অদম্য ইচ্ছার মধ্য দিয়ে তিনি সঞ্চয় করে নেন প্রেরণা। তারপর কবিতাপাগল কবি হরিপদ দে বলেন যে কুশীলবের মত 'নিখুঁত নিপুণ অভিনয় করে যেতে হবে।' এরই ফাঁকে মোনালিসার হাসি, পিকাশোর মুরাল, বিয়াত্রিচেও তাঁর ভাবনায় ধরা দেয়।

আধুনিক কবিতার জটিল প্রকাশ-বন্ধনে হরিপদ দে আবদ্ধ হন না। তিনি যা বলতে চান তা স্পষ্ট করেই বলেন—'কিছু বলতে চাই, কাউকে কিছু বলতে চাই/সমুখে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে চোখ রাখি/তারপর গুটিয়ে নিই বুকে।' হরিপদ দে ভাবপ্রকাশের জন্য বলিষ্ঠ শব্দের অন্বেষণ করেন তাই তাঁর কিছু শব্দপ্রয়োগ যথার্থ মনে না হলেও কাব্যরস আস্বাদনে ব্যাঘাত

ঘটায় না। কবিতা তাঁর হৃদয়ে তাই তাঁর কবিতা শেষ পর্যন্ত পড়তে বাধ্য হতে হয়।

হরিপদ দে প্রসঙ্গে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'হরিপদ দে কিছু বলতে চান, এবং তাঁর বলবার ভঙ্গির মধ্যে বেশ জোরালো রকমের কিছু অভিঘাতও তিনি তৈরি করে তুলতে চান। তাঁর কবিতার মধ্যে বারে বারেই সেই অভিঘাতের সামনে গিয়ে দাঁড়াই আমরা।'

ভাবতে ভাল লাগে হরিপদ দে লিখছেন আর কবিতার জগতে নিজের আসনটি দৃঢ় করার জন্য নিষ্ঠায় ব্রতী আছেন।

—অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়

অরণ্যে অন্তরীণ ॥ হরিপদ দে ॥ চার টাকা ॥ গঙ্গোত্রী প্রকাশনী ॥

৫

ষাট দশকের গোড়ায় যাঁরা কবিতা লেখালেখি শুরু করেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সম্প্রতি সজল বন্দ্যোপাধ্যায় তার "ব্যক্তিগত কবিতা"য় বলেছেন: 'বেশ কিছু কবি পরবর্তীদের অনুসারী হয়ে সুনাম ও সুযোগ-সুবিধা আদায়ে তৎপর হয়েছেন একথা সত্যি, কিন্তু অন্যদিকে তলে তলে প্রতিরোধের চেষ্টা ও কবিতা ভাবনায় নতুন পথসন্ধানের চেষ্টাও শুরু হয়ে গিয়েছিল।' এখন এই নতুন পথ সন্ধানী কারা, সে সম্পর্কেও সজল বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট—তাঁর ধারণা গড়ে উঠেছে, পরেশ মণ্ডল, তপনলাল ধর, অশোক চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, অতীন্দ্রিয় পাঠক, ইত্যাদি এবং আংশিকভাবে মৃণাল বসুচৌধুরী, অশোক দত্তচৌধুরী, এবং কালীকৃষ্ণ গুহের কবিতা থেকে। ষাটের কবি ও কবিতা সম্পর্কে যারা সামান্য ওয়াকিবহাল, তাদের বুঝতে আর বাকি থাকে না, 'কি কবিতা ভাবনায়, কি জাগতিক প্রতিষ্ঠা-লোলুপতায়' 'পূর্ববর্তীদের অনুসারী' বলতে সজল বন্দ্যোপাধ্যায় কাদের বুঝিয়েছেন। 'জাগতিক প্রতিষ্ঠা-লোলুপতা' শব্দটি এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কেননা অর্থহীন; কিন্তু কবিতা ভাবনার স্বাতন্ত্র্য কি ষাটের অন্য কয়েকজন কবি, যা সজলদার লিস্টের বাইরে, দাবী করতে পারেন না? প্রশ্ন এ কারণেই যে তাদের মধ্যে আমাদের ভাল লাগা কবিরাও থেকে গেছেন। আর একথা যেমন সত্যি, তেমনি এটাও, যে আমাদের ভালো-না-লাগা, এলেবেলেরাও তাঁর কাছে নতুন

পথ সন্ধানী হয়ে উঠেছেন।

যাক সে কথা। প্রসঙ্গের সূত্র শুধু এটুকুই যে সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ও এমন একজন, যিনি ষাটের গোড়ায় এমন নতুনতের চেষ্টায় রত হয়েছিলেন। কেননা জেনেছিলেন, 'নতুনভাবে লেখার চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই।' এখন সজল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমপংক্তিভুক্ত কবিদের এই নতুন চেষ্টাকে যেভাবে সূত্রে সাজিয়েছেন, তা হল: ক) লিরিকের নিয়ন্ত্রণ ও ভাবালুতা বর্জন। খ) কবিতা একটি ভাষাশিল্প—সচেতন নির্মিতি হিসেবে দেখা। গ) শুদ্ধ কবিতার প্রতি ঝোঁক। ঘ) আংশিক এ্যান্টি পোয়েট্রির দিকে ঝোঁক···ইত্যাদি। এঁদের নিজস্বতা এসব নিয়েই; এগুলি মনে রেখে সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পিকাসোর নীল জামা' এবং 'মাঁড়'-এর কবিতাগুলো পড়লে ব্যাপারটা আর কষ্টসাধ্য থাকে না। কিংবা প্রশংসা সূচক অর্থে বললে—এই কবিতাগুলো পড়তে শুরু করলেই সজলদার নিজস্বতা এবং ওই সূত্রগুলো স্পষ্ট হতে পারে। আমারও হয়েছে অংশত। তবে পলভ্যালেরির অনুগামী ইংরাজী ভাষী কবিদের আঙ্গিকচর্চার সঙ্গে তুলনা করা অপ্রাসঙ্গিক, কেননা সজলদা বাংলায় লেখেন। যেমন—টুথপেস্ট। সাবান! তোয়ালে। চা। টোস্ট। সিগারেট! পাইপ। সিগার···' ইত্যাদি শব্দ সাজিয়ে কবির 'ভ্রমণবৃত্তান্ত কিংবা 'মাছি/বুকে মুখে/মাছি/কোমর জড়িয়ে/মাছি···ইত্যাদি। এখন এই ধরণের লাইন সাজানোর খেলায় যে চাতুরি আছে তার চটুল আঁঠা পাঠকের কানে অনেকক্ষণ লেগে থাকে। সুতরাং তার অনায়াস নাব্য গতি সুখপাঠ্য হতে বাধা থাকে না। এর মধ্যে কবি-কথিত এ্যান্টি-পোয়েট্রির উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন পাঠকেরা, কিন্তু একই ধরণের শব্দের ব্যবহার যে গিমিকের পথ প্রশস্ত করে, তাতে সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়মিত পাঠকের কান বিব্রত বোধ করতে পারে, এমন আশংকা থাকে। যেমন, 'পিকাসোর নীল জামা'র একটি কবিতায়—'কলঘরে জল ঢালার শব্দ—/তারপর/বারান্দায় স্লিপারের শব্দ—/তারপর···'এবং এর পর 'মাঁড়' এর 'শব্দ/দরজায় ছুটে যাই/শব্দ/ঘরে ফিরে আসি' কিংবা 'কি চাও?—জানি না/কাকে চাও?—জানি না/দাঁড়িয়ে কেন?—জানি না···ইত্যাদিতে। তবে শব্দ নিয়ে খেলা শুধু নৈর্ব্যক্তিক, শুধু এ্যাবসার্ডিটিকে ঘিরেই নয়। পারিপার্শ্বিকতা প্রতিটি কবিতার সঙ্গে জড়িয়ে, কিংবা বলা যায় প্রতিটি কবিতাই কবির পারিপার্শ্বিকতাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। তবু থাকে স্বপ্ন, রহস্যময়তা···'ঘুমের মধ্যে/

শুধু রক্তপাত/ভয়ে ভয়ে হেঁটে চলা', যা তাঁকে নিঃসন্দেহে আধুনিক করেছে, এবং কবিও। এখানে 'শুদ্ধ কবিতা', 'এ্যান্টি-পোয়েট্রি' বলে কিছু নেই। আর লিরিকধর্মিতা! কোথায় নেই, শব্দকে ভেঙে অর্থবহ এবং দৃশ্যগত করার মধ্যে লিরিক্যাল সজল বন্দ্যোপাধ্যায় উঠে আসেন। ভাবালুতা নেই, ফলত মেদবর্জিত কবিতার শরীর, যা দৃশ্যত। কিন্তু টুকরো টুকরো 'মীড়ে'র কাজ আলাদা আলাদা ভাবে আবিষ্ট করলেও সামগ্রিক কোন আবহ মনের মধ্যে তৈরি করে না। যে তাৎক্ষণিকতা কবিতার পংক্তিতে, তার সাজুয্য কবির 'মুড' ও মানসিকতারই অন্তর্গত; এবং এর সঙ্গে পাঠকের সম্যক পরিচিতি ব্যতিরেকে ওই খণ্ডতার কোন পরম্পরা মেলেনা। সজল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে এটাই আমার ভয়—মুডের টুকরো মীড় দিয়ে যে মণ্তাজ তিনি তৈরি করতে চান, পাঠককে সে সময় পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবেন তো? ভয়, কেননা পাঠক বাংলা কবিতার।

—সৈয়দ কওসর জামাল

পিকাসোর নীল জামা ঃ সজল বন্দ্যোপাধ্যায়। পিলসুজ, ১৬/১/১ ওলাবিবি-তলা ১ম বাই লেন, হাওড়া। দাম—পাঁচ টাকা। মিড় ঃ সজল বন্দ্যোপাধ্যায়। পিলসুজ। দাম—এক টাকা।

৬

হিমাংশু জানায় তৃতীয় কবিতার বই। একত্রিশটি কবিতার সংকলন। কবির মেজাজ রোম্যান্টিক। হাত মিষ্টি। ফলতই কবিতাগুলি জমেছে। উপরন্তু যে-কোন কথাই কবিতায় কিভাবে বলতে হয়, সে শৈলী কবির আয়ত্তে। মূলত প্রেম এবং নিসর্গ চিন্তাই কবিতাগুলির মুখ্য বিষয়। প্রকৃতির প্রতি অবহেলা কবিকে ব্যথিত করে।

ভাঙছে ডানা একটি-দুটি পাখি,
দুলছে মৃদু মেঘের লঘু ভেলা,
কেউ দেখে না, হায় রে, অবহেলা—
ভালোবাসাবিহীন বেঁচে থাকি।

যে-ভালবাসা তাঁর কবিতায় চিত্রিত হয় এইভাবে—

পাইনি কারো হাতের ছাঁচি পান,
কেউ করে নি চোখের পাতা ভারি।

কিম্বা—কেউ বলেনি 'আর একটুকু থাকো।'

কোন কোন কবিতায় পাঠক ও কবির হৃদয়কে ছুঁতে পারেন, তারই সঙ্গে যেন বলে ওঠেন সবুজবরণ গাছে ফুটে উঠলে হলুদবরণ ফুল যেন কাকে মনে পড়ে;

কার কাছে যেন ফেরাই হয় না বহুকাল॥

নিজের মত করে বলবার প্রবণতাও তাঁর কবিতার কোন কোন লাইনে চোখে পড়ে—

হৃদয় বুঝি অতি রুগ্ন অথচ শত্রুঘ্ন ছুরি
একমুঠো রোদ হঠাৎ মেঘের বৃষ্টি ফোঁটা ঃ ইলশেগুঁড়ি।

কবি-ভাষায় যে স্বাতন্ত্র্য একজন কবিকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়, তার পরিচয় বিক্ষিপ্তভাবে থাকলেও, পুরোপুরি তাঁর কবিতায় এখনও অনুপস্থিত। 'কে কাঁদো', 'এ এক অসুখ' প্রভৃতি কবিতার দিকে তাকিয়ে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় হিমাংশু জানা নিষ্ঠাবান এবং প্রতিশ্রুতিবান কবি।

—দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রতিশ্রুত নই/হিমাংশু জানা/বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। মূল্য ঃ তিন টাকা। প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৮।

৭

'শুধু তোমার জন্যে' সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রথম কবিতার সংকলন। সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ইদানিং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। 'শুধু তোমার জন্য' একটি প্রেমের কবিতার সংকলন। 'নতুন পরিচয়' কবিতায় যেমন বলেছেন—চলো যাই/সুদূর কোনো প্রান্তে কোনো লুকানো জায়গার/লিখে আসি/নিজেদের নাম ঠিকানা/অথবা 'হলুদ প্রজাপতি' কবিতায় টেবিলের ওপর/উড়ে আসা হলুদ পাতা/তুমি আমায় বাঁচালে। এই রকম প্রতিটি কবিতায় প্রেমের কথা বলা হয়েছে। প্রেম মানুষের জীবনে আসে আবার চলে যায়। এই প্রেম থেকে মানুষের বেঁচে থাকাটাই একটা সংগ্রাম।

এই সংগ্রামের কবিতা যদি এই সংকলনে থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই ভাল হত। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ খুব সুন্দর হয়েছে।

—চিত্রভানু সরকার

শুধু তোমার জন্য/সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক ঃ ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিঃ ৯। ৮ টাকা।

৮

শুভ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থে নিজস্ব বিপন্ন দুঃখবোধ উদাসীন ভংগীতে লিখেছে। কবিতায় চাতুরীকে অগ্রাহ্য করে, শুভ সরাসরি কবিতায় বসিয়েছে এক রহস্য অনুভূত জগৎ, যার কাছাকাছি আমাদের বসবাস। যার স্পর্শ আমাদের প্রলুব্ধ করে। তাই তার চলার রাস্তা আলাদা; বাসার ধুলো, বালি এমন কি উপরের আকাশ তার সময়ের কবিদের থেকে কিছুটা পৃথক। এই স্বাতন্ত্রবোধ শুভর একান্ত ব্যক্তিগত, কেননা সে মানুষের শুভ বিশ্বাস ও সৌজন্য শিক্ষাকে বড় করে দেখতে চেয়েছে কবিতায়। স্বল্প পরিসরে শব্দকে করেছে কবিতার ঘর ও বাহির।

শুভর কবিতায় তিনটি দিক আছে। প্রথমতঃ কবিতা তার দুঃখকে কেন্দ্র করে ভাবনার পরিধি, তবু কোন কবিতাই তার দুঃখের কবিতা নয়। বরং দুঃখ জয়ের দিকে, দুঃখকে আলোকিত করার দিকে এগিয়ে চলা, এগিয়ে চলা। 'খুব শান্ত', নীচু স্বরে তার বলার ভংগী। কোথাও চীৎকার নেই, টুকরো অনুভূতি শুধু লেগে আছে। দুঃখকে তীব্র শব্দে বলার, চেষ্টা করেনি শুভ। দুঃখ জয়ের ক্ষণকে সে ধরতে ভালবাসে এক আঁধারে আলোয়। অল্প কথায় শুভ বিশ্বাস করে নিজেকে প্রকাশ করা যায়। জেগে ওঠা যায়। 'কে রয়েছে মনে হয়' কবিতায় তাই শুভ লেখে 'একে একে জন্মদিনকে মনে পড়ে যায়।' সে যে তোমার জন্য/বারবার/ফিরে ফিরে দুঃখ জেলে রাখে/এ ঘরে মানুষ জাগে। কিংবা 'জয়োৎসবে দিকে' কবিতায় 'সে কালো নদীটি'র দিকে হাত বাড়াতো বন্ধুতায়। প্রতি রাতে কে অনায়াস ভেসে পড়তো সহজ যানে। মানুষবিহীন ঘর রেখে জয়োৎসবের দিকে।'

দ্বিতীয়ত শুভর কবিতায় আবেগের প্রশ্রয় কিছুটা বেশী। আবেগকে

সে কৃপণ হাতে লাগাম টেনে ঝকঝকে আধুনিকতায় আপাদমস্তক সাজায় নি। খুব সংবেদনশীল মন নিয়ে কখনো সে পেরিয়ে গেছে কবিতার শরীর থেকে। কিছুটা দূরে। হয়ত অসাবধানে কিংবা পুরোনো পরিধানে একাধিক বার উচ্চারিত হয়েছে একই পংক্তি। যার পরিমণ্ডল প্রাথমিকভাবে কবিতার শরীরে ছড়ানো।

তৃতীয়ত শুভর কবিতায় ফেলে আশা প্রিয় দিন, প্রিয় জিনিস-এর প্রতি সকরুণ মমতবোধ খুব ধরা পড়ে। জন্মদিনের জন্য এক গোপন হৃদয় সর্বদা জেগে থাকে। কবিতা তাকে পৌঁছে দেয় প্রিয় দিনের দিনযাপনের খবর, তার ক্ষয়, বিষণ্ণতা, আনন্দ ও ঘুম। প্রচ্ছন্ন অবহেলার সে এক জীবনের তুচ্ছতাকে দেখতে ভালবাসে। চারপাশের পরিচয়হীন কৃষ্ণলতা প্রকৃতি থেকে খুঁজে নেয় আরোগ্যের সুখ। একা জেগে থাকে তার মন, যখন চার-পাশে 'গহন শোকাত' থাকে বেলা।

কবিতার মূলে সুর নরম হলেও 'প্রতিদিন, প্রতি রাত্রিবেলা', 'মাটি কোন ব্যাথা টানে' 'জন্মদিন বালকের স্মৃতি' খুব ঋজু কবিতা। বিপন্ন দুঃখবোধ, এক ধরণের চাপা অহংকার, জীবনের প্রতি এই মমতবোধ এই সব কবিতার বিষয়। 'আমাদের ভিখারী বানাও' কবিতাটি এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। যে উদাসীনতা প্রথমে লিখেছি, সেই কথা আবার লিখতে হচ্ছে কেননা বুকে বেজে ওঠার মত লাইন শুভ লিখেছে 'কি এমন গৈরিক সন্ন্যাসে / জলের কিনারে ওরা হাত পেতে বলে ওঠে / হাওয়া দাও / তোমার শরীর ভেঙে হাওয়া দাও / হাওয়া দাও অরুণা ধরণী।'

শুভর কবিতার বিষয় যেমন আমাদের অপরিচিত নয়, তেমনি নয় তার ছন্দের দক্ষতা। কিন্তু যেটা খুব গভীরভাবে পেতে চাই তা হল তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক। ছন্দের ক্ষেত্রে যতটুকু তা আমাদের উপরি পাওয়া। কিন্তু ভংগীমায় আরো অমোঘ হলে, কবিতা পাবে তার নিজস্ব দখল।

—সুতপন চট্টোপাধ্যায়

'প্রতিদিন প্রতি রাত্রিবেলা' ঃ সুবর্ণরেখা। ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলি-৯। দাম—তিন টাকা।

৯

মিলনান্ত কবিতার দিকে ঝোঁক প্রথমার্ধে যেমন দেখা গেল কবির পরবর্তীতে তা মিলিয়ে গেলেও কবিতার এক-একটি লাইন যমক অলংকার গঠন করার দিকে নজর বেশি দেখা গেল। অন্বেষণে শব্দ চয়ন বিকৃত রুচির পরিচয় না হলেও, ভাবগম্ভীর শব্দ প্রয়োগ কবিতাতে অপাংক্তেয়ই হয় না, হয় দুর্বল রচনা। বক্তব্যবহুলা যেখানে কঠিন কোন দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়ন ঘটায় না, যেখানে বিক্ষিপ্ত শব্দ আনয়নে কি হৃদয়গর্ভতা বহন করে। আহ্বানধর্মী কিছু কবিতা নোতুন সূর্যোদয়—নোতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখায়, কিন্তু পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উন্নতমানের আদর্শের নজির থাকে না বলে স্থূল প্রতিপন্ন হয়। উপমা নির্বাচন বাঁধনহারা কবি কল্পনার প্রতীক। কারণ 'এক বাণ্ডিল ঝড়ো হাওয়া' বা 'এক বাণ্ডিল দুঃখ' আমরা শুনতে অভ্যাস তো নই। যেমন ম্রিয়মান লাগে ঘুণ-ধরা সমাজ বা সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে তাকে ভেঙে নতুন ইমারত গড়ার স্বপন আজকের দিনে কেমন যেন বাসি অনুভূতি। কারণ পূর্ববর্তী বহুজনের একই অভিব্যক্তি একালের উৎকণ্ঠে পাঠকের কাছে বেমানান। বেদনার্ত হৃদয় কবির নানাভাবে জর্জরিত হয়, তারই বহিঃপ্রকাশ নিরূপণ করেন নানাবিধ প্রতীকের সাহায্যে। মূল্যায়ণ অবশ্য হয় না। ব্যক্তিমানসের দুঃখবোধ অপেক্ষা বেশি করে বাজে হৃদয়ে যেটা সমাজ বা পারিপার্শিক মানুষ মনের অন্ধকার অভিসন্ধির কথা। যেটা তাঁর কাছে 'মান সম্বন্ধে যার হুঁস আছে, সেই মানুষ'। মান এবং মর্যাদাবোধ এবং বুদ্ধি আজ ধূলায় লুণ্ঠিত, মানুষ আজ দ্বৈরাচারী-বিধ্বংসী বন্যায় শতচ্ছিন্ন। এই যে মানুষ এবং তার গড়া যে সমাজ তাকে পুনরুত্থিত করতে সকলের যে অনুদান আছে তারই অবতারণা ঘটেছে বারংবার কবির মেজাজে এবং সচেতনতা করতে তাঁর ইচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে একাধিক কবিতা উদ্ধৃতিতে। প্রাকৃতিক বর্ণনভঙ্গি কবিতাবলীতে অতি রোমান্টিকতা দেখিয়েছেন। নামধর্মী কয়েকটি কবিতায় গতানুগতিক রূপায়ণ দেখা গেছে, যেমন—'করুণা বাড়ীতে নেই···বাড়ি বদল করেছে' (করুণা)। পাহাড়ী ঝর্ণাকে মেয়ে হিসেবে কল্পনা করেছেন সেকেলে পন্থীর মতো। দীর্ঘ কিছু কবিতায় স্থির বক্তব্য বা নিটোলতা প্রকাশ পায় নি একাধিক চরিত্র-চিত্রাবলীর মাধ্যমে। হারিয়ে গেছে মূল ভাবধারা অতি বড় ফ্রেমে ধরা ছবির জন্যে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলেই বোধহয়

অতি দোষে দুষ্ট হয়ে উঠেছে। কবিতা চয়নের ক্ষেত্রে অতি মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল। কবি বা কবিতা স্বীকৃতির প্রথম ধাপ একটু মজবুত হলে ভালো হয়। ভবিষ্যতে আশা করবো আরো যত্নবান এবং ধৈর্যশীল হয়ে দ্বিতীয় গ্রন্থ উপহার দেবেন। চারু খানের প্রচ্ছদ উচ্চমানের হয়েছে।

—অমিত কাশ্যপ

উত্তরের রোদ্দুরে : নির্মলকুমার ঘোষ, নয়ন পাবলিশার্স, কলকাতা—৯। মূল্য—ছয় টাকা।

১০

কবিতায় নতুন স্বাদ আর নতুন দিগন্তের অনুসন্ধানে অহরহ অনুক্ষণই যাঁর সফল এবং সার্থক অভিসার-অভিযাত্রা তিনি হলেন ইদানিংতন কালের অন্যতম প্রধান বিবেকবান বিদগ্ধ কবি—বার্ণিক রায়। 'আনন্দের মর্মরিত অন্ধকার' থেকে স্বরু করে 'নীল দুপুরের ভয়' আর 'শরীরের উদ্ভিজ্জ ছায়ায়' এর পর তাঁর চতুর্থ তথা নবতম কাব্যগ্রন্থ হল 'হে আমার মৃত্যু'। কাব্য-সাধনায় উদ্দীপ্ত কবি বার্ণিক রায় নব নব বোধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিত্য নিরন্তরই কেবলমাত্র অভিনব-অত্যাশ্চর্য জগৎ ও জীবনের স্বর্ণসিংহ তোরণ, দ্বারে পৌঁছে যান তা নয় আপন অসাধারণ অনির্বচনীয় মননশক্তিবলে অনায়াসে অবহেলায় তিনি তার বিপুল গভীর গহন গোপনে প্রবেশ করে অবলীলাভরে সেখান থেকে মণি-মুক্তো, রত্ন-হেম আহরণ করে এনে কাব্যজগৎকে অননাসাধারণভাবেই সজ্জিত সমৃদ্ধ করে তোলেন—তারই প্রকৃষ্ট প্রোজ্জ্বল প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁর উপরোক্ত চারখানি কাব্যগ্রন্থ—বিশেষতঃ 'হে আমার মৃত্যু' শীর্ষক তাঁর এই চতুর্থ তথা নবতম কাব্যগ্রন্থখানি।

এই জগৎ ও জীবনকে কবি আপনার সমস্ত প্রাণ মন অন্তর তথা আপনার সকল সত্তা—সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে অত্যন্ত গভীরভাবেই ভালবাসেন। আর তারই অনিবার্য অনস্বীকার্য ফলশ্রুতিস্বরূপ যুগপৎ আপনার পরিপূর্ণ জ্ঞাতসারে এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেও অনাদ্যন্ত মৃত্যুচিন্তা—মৃত্যুচেতনা সদা-সর্বক্ষণ হয় স্থূল পাথর প্রতিমার মত—নতুবা নিরাকার নির্বিকল্পভাবে তাঁর মনের নিভৃতে জাগ্রত থাকে। তাইতো কবি স্বতঃই মনে করেন—

'জীবনে মৃত্যু তার দখল নিয়ে বসে বুকের ভেতরে গলুই ঠেলে এগোচ্ছে, আমি যেমন এগোচ্ছি তার দিকে। তাই তামার অস্তিত্ব মৃত্যু দ্বারা রন্ধ্র-পূর্ণ'। কিন্তু কবির অন্তর মৃত্যুভয়ে মোটেই শঙ্কিত—কম্পিত নয় কখনই। যুগপৎ মৃত্যুকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েই তিনি পরিপূর্ণরূপে অস্বীকার করার এক অতুলনীয় অলৌকিক শক্তি ধরেন। কবি মানসের সমর্থনে তাঁর সুস্পষ্ট সওয়াল জবাব ঃ 'ইচ্ছে হয়, জগতের অন্ধকার বাসনা ত্যাগ করে মৃত্যুতে পক্ক ফলের মত অন্ধকার ও মধুরতার নতুনরূপ রূপান্তরিত হয়ে উঠি।'…

জীবন আর মৃত্যু সম্পর্কে আপনারই অনাদ্যন্ত-অতলান্ত বোধি থেকে সাগ্রহে-সোচ্চারে কবি বলে ওঠেন—'জীবন ও মৃত্যু একই উৎস, বিবস্বান সূর্য থেকে উৎসারিত।' এবং শেষ পর্যন্ত উপসংহারে তিনি উপস্থিত হন এক মহান মধুর, অভিনব-অপরূপ সিদ্ধান্তে ঃ 'আমরা যখন মৃত্যুকে সৃষ্টি করি ইচ্ছা বাসনায়, তখনও স্রষ্টার মত আমাদের একই অবস্থা। মৃত্যু জীবনের ভালবাসা শান্ত সুরে ছড়িয়ে পড়ে প্রশান্তির ধ্যানে। ফলের ভেতরে অন্ধকার ও মধুরতা গাঢ় রসে ব্যাপ্ত।'

—পূর্ণেন্দুশেখর পণ্ডিত

হে আমার মৃত্যু ঃ বার্ণিক রায়। প্রাচী-প্রতীচী ঃ ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯। মূল্য ঃ পাঁচ টাকা।

১১

রমানাথ ভট্টাচার্য কলকাতার বাইরে থাকেন। শিলচরে। রমানাথ ওখানকার জলহাওয়ার সংগে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। কবিতার মধ্যেও সেই ছোঁয়াই লেগে আছে। এই সংকলনের প্রথম কবিতায় 'তুমি এলে'/বার বার পড়লেও মনে হয় পড়া হল না! খুব সুন্দর। এই রকম আর একটি 'আমি এখানে'; তুমি এলে উজ্জ্বল হাসির স্রোত/ডেকে ওঠে হাজার কোকিল/করতালি দিয়ে গায় গম্ভীর সমুদ্র/তুমি এলে জ্যোৎস্না শুধু সোনালি সময়/হীরা নীড়, নবীন রোদ্দুর। এই রকম প্রতিটি কবিতাই স্মরণীয়। অপূর্ব লিরিক্যাল মেজাজ। সহজ সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে কবিতার পাহাড়। যে পাহাড়ে আমরা সকলেই উঠতে চাই। রমানাথ ভট্টাচার্য সেই কবিতার

পাহাড়ে পৌঁছে দেবার কবিতা লিখেছেন—'লৌকিক বৃত্তের ভিতরে'।

এই কাব্যগ্রন্থটি পড়তে গিয়ে একটা কথাই বারবার মনে পড়ছে যে বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা থেকে বহু দূরে থেকেও সাহিত্যচর্চা করা যায়। আসলে পত্র-পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত না হলেও অনেকেই ভাল কবিতা লিখতে পারেন। রমানাথ ভট্টাচার্যই সেই অনেকের মধ্যে একজন। এই কথা বলার একমাত্র কারণ যে রমানাথ ভট্টাচার্যের কবিতা পশ্চিমবাংলার পত্র-পত্রিকায় বেশী প্রকাশিত হতে দেখিনি। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নাহলেও কিছু আসে যায় না, লেখাটাই আসল। এই বইটি আলোচনা করতে গিয়ে তাঁকে বলবো দ্বিতীয় বই বের করতে। এই কথা এই জন্য বলবো যে আরো কিছু ভাল কবিতা পড়তে পারবো। সেই সংগে কবিতা পাঠকদের অনুরোধ করছি রমানাথ ভট্টাচার্যর কবিতা পড়বার জন্য।

—জীবন সরকার

লৌকিক বৃত্তের ভিতরে/রমানাথ ভট্টাচার্য, বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা-৯।

১২

'আমাকে জাগিয়ে রাখে' গৌরশংকরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ৭৪টি কবিতা এই বইয়ে সংযোজিত হয়েছে। গৌরশংকর আজকাল বিভিন্ন পত্রিকায় বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে লিখছেন। চোখে পড়ে। গৌরশংকরের কবিতার একটি গুণ সরলতা। সরলতার মধ্যেই তিনি টেনে আনেন কবিতার রূপ। একটা শ্রীময়ী শ্রীময়ী ভাব। ব্যাপারটা সোজা দেখতে হলেও, সোজা নয়। মার-প্যাঁচ নেই; দর্জির দক্ষতার কাজ নেই; নাই থাকুক, সাদামাটা বুনটে তিনি নিয়ে আসেন আরাধ্যকে। কবিতা তাঁর বাক্যের গঠন প্রণালীর মধ্যেই উঁকি দেয়, তা অন্তরসঞ্জাত বলে।

তিনি যখন লেখেন—

'গ্রীবার কাছে থম থম অহংকার
বুকের কাছে লুকিয়ে আছে আদুল কথাবার্তা'

তিনি খুব সুন্দর উপমায় ধরে আনছেন জিনিসগুলোকে—বেশ বুঝা যায়।

অথবা

'শুধু নিরেট নিশানা একমাত্র থ্রি নট থ্রিতে

.....

আমি ঐ কঠিন স্তব্ধতা ভেঙে দিতে চাই'

শুনলে মনে হয়, তিনি জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন।

আরো চর্চা, আরো অনুশীলন তাঁকে সাবলীল ও পাকাপোক্ত করবে—আমরা আশা করতে পারি।

—নির্মল বসাক

আমাকে জাগিয়ে রাখে/গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী প্রকাশনী, ২০ চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-২৫। দাম—পাঁচ টাকা।

১৩

বারোটি সুনির্বাচিত গল্পের সংকলন শিকার কাহিনী। শৈলেন চৌধুরীর লেখা খুব বেশি পড়া নেই, কিন্তু এই সংকলনটি হাতে পেয়ে আক্ষেপ হয়েছে যে তাঁর লেখা এতদিন কেন যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে পড়িনি! গল্পের বিষয়-বস্তু নির্বাচন এবং মুন্সীয়ানা সহকারে তা প্রকাশ শৈলেনবাবুর বৈশিষ্ট্য। জোলো অভিজ্ঞতার বেসাতি তিনি কোথাও করেন নি। লেখক হিসেবে দায়বদ্ধতার ব্যাপারেও তিনি সর্বদা সজাগ এবং যথাযথ। কলকাতার মস্তান, ফুটপাথের ঝুপড়ি, হাওড়ার হাট থেকে উদ্বাস্তু কলোনী অবধি তাঁর অনায়াস বিচরণ; কোথাও তাঁকে বেমানান মনে হয়নি। তাঁর অভিজ্ঞালব্ধ তীক্ষ্ণ চোখ সর্বত্রই তাই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে বাস্তব বিশ্লেষণে এবং বর্ণনায়। 'নন্দ' (ঘর) 'ওস্তাগর ইশাকউদ্দীন মোল্লা' (ওস্তাগর) তাঁর অতুলনীয় চরিত্রসৃষ্টি। অন্য স্বাদের গল্প 'খুঁজে ফিরি' সব মানুষের বিমূর্ত ইচ্ছার এক সুন্দর অভিপ্রকাশ। 'শেঠ আনন্দীরাম সোমানি ও রাজ-কুমার' গল্পের আপাত কৌতুকের পিছনে তাঁর তীব্র সামাজিক অসন্তোষ আমাদের মনে সহজেই রেখাপাত করে।

বইটি উল্লেখযোগ্য বলেই কিছু কথা মনে হয়েছে। প্রথমতঃ শৈলেন চৌধুরীর বহু লেখাই বিস্তারে এত ছোট যে অনেক সময়েই তা ঠিক গল্প হয়ে উঠতে পারে নি। ঠেকে মনে হয়েছে। বস্তুতঃ সৃষ্ট চরিত্রটি গল্পে

প্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই তাঁর লেখা শেষ হয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে শৈলেন বাবু একটু ভাবতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ যে গল্পের শিরোনামে তাঁর পুস্তকের নামকরণ সে গল্পটিতে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতের চরিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি তাদের সমাজের কোন আঘাটায় ছেড়ে এলেন?'সরমা' সহ তাদের কি তিনি অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। তৃতীয়তঃ তাঁর কাছে একটি আবেদন—ব্যক্তি প্রতিবাদের কথা তাঁর লেখায় প্রায় সর্বত্র। সমষ্টি প্রতিবাদ। আন্দোলনের গল্প তিনি লিখুন।

—দীপক সরকার

শিকারী কাহিনী ঃ শৈলেন চৌধুরী; পুস্তক বিপণি ঃ ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯; মূল্য ঃ আট টাকা।

১৪

ভূমিকায় উল্লেখ না থাকলেও ধরে নেওয়া যায় নির্বাচিত সংকলনের বাছাইয়ের কাজটা লেখকই করেন। তাতে তার সৃষ্ট অনেক শ্রেষ্ঠ বা ভাল গল্প বাদ পড়ে যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু পাওয়া যায় লেখকের মেজাজ তাঁর ভাললাগা বিশিষ্ট অনুভূতির বিচিত্র অলিগলির সম্পাদ।

এক কথায় নির্বাচিত সংকলনে লেখক পাঠকের কাছে অনেক বেশি সহজ, একান্ত হয়ে ওঠেন, এ ধরণের সংকলনের সার্থকতা বোধহয় সেখানে! বর্তমান সংকলনে লেখক মোট দশটি গল্প আমাদের উপহার দিয়ে একথা প্রমাণ করেছেন। গল্পগুলি লেখা হয়েছে '৭২ থেকে ৮১ সালের মধ্যে যে সময়টা পশ্চিমবাংলার মানুষের পক্ষে খুবই রুক্ষ. কঠিন যন্ত্রণা বিধ্বস্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে। গল্পগুলোর মধ্যে সমকালীন জীবনের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। লেখক সাম্প্রতিক সময়ের জীবন যন্ত্রণাকে ছুঁতে চেয়েছেন। সমাজের নানা স্তরের জীবন যুদ্ধে বিক্ষত মানুষের সংগে একাত্মতা বোধ করেছেন, কখনও কখনও তিনি অত্যন্ত নিস্পৃহতার সংগে পাঠককে সে যন্ত্রণার অংশীদার করে ফেলেছেন। যা সাম্প্রতিককালে অনেক প্রগতিশীল গল্পকারদের মধ্যে অনুপস্থিত। সেদিক থেকে শ্রীচট্টোপাধ্যায় একটি নির্দিষ্ট পরিণতির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন বললে বোধহয় বেশী বলা হবে না।

কিন্তু সে সমাজ-ভাবনা এবং গল্পে তার প্রয়োগ একজন প্রগতিশীল লেখকের বৈশিষ্ট্য এনে দেয় সেখানে লেখক আরও একটু মনোযোগী হবার হয়ত অপেক্ষা রাখেন। অন্তত অনেকগুলো গল্পে যে সম্ভাবনাময় পরিণতির অবকাশ ছিল যে-কোন কারণেই হোক লেখক তার সদ্ব্যবহার না করে আমাদের হতাশ করেছেন।

প্রথম গল্প 'শত্রু'রকেই ধরা যাক, নিম্নবিত্ত সমাজের এক নগ্ন চিত্র। কিশোর পোটকা 'শালপাতা চাটা কুত্তার মতো স্টেশনের আশেপাশে ঘুরঘুর করা বিচ্ছুরে বাচ্চাদের মধ্যে সেও একজন'। মা সেজে-গুজে সহরে যায় দেহ বিক্রি করতে। 'বাপ বিপিন একদলা মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছুই নয়'। সামাজিক অবজ্ঞায় কত নিষ্ঠুর নগ্ন হয়ে সমাজদেহের পচন ধরিয়েছে এ যেন তার এক নিখুঁত চিত্র। কিন্তু পরিণতিতে বাৎসল্য রসের এক ভেজাভেজা অনুভূতি। নিজের পেটের ছেলেকে মায়ের শত্রুর মনে হওয়ার সংগে সংগে লেখক কিন্তু আসল শত্রুরকে একবারের জন্যেও পাঠকের সামনে এনে হাজির করতে পারেন নি। যা পাঠকের প্রত্যাশা ক্ষুণ্ণ করে।

পাতক গল্পের পগা আমাদের অনেক বেশি সহানুভূতি দাবী করে। ধাঙড়া পাড়ার কিশোর পগা শুকনো কলাপাতা পুড়িয়েমাজন বানিয়ে চটকলের মজুরদের কাছে বেচে সামান্য আয় করে। সারা বছরই প্রায় উপোষী থাকে। সে গাজনের সন্ন্যাসী হয়ে নিরম্বু উপবাসী থেকেও উঁচু বাঁশ থেকে ঝাঁপ দিতে না পেরে পাতক হল। কিন্তু সে যখন বলে, 'পাপী বলবেন না, সারা বছরেই উপোষ ভাঙে না তো এই চারদিন, তিনবাঁশ থেকে লাফাতে পারি ?

তখন কিন্তু ধর্মভীরু গ্রামের মানুষগুলোর কাছে কিশোর সন্ন্যাসীটি পাতক হলেও পাঠকের বুকে জায়গা পেয়ে যায়।

'ঢোল সমুদ্র' একটি পরাজিত মানুষের গল্প। নায়ক প্রহ্লাদ মালিকের দাদন নিয়ে শুয়োর চরান দলের সংগে ঘোরে। গ্রীষ্ম বর্ষা মাথার ওপর দিয়ে যায়, অনেক নগর জনপদ পেছনে ফেলে একদিন জঙ্গলের আশ্রয়ে সে পায় ভালবাসার সন্ধান। ফলে সর্দারের সঙ্গে লড়াই। নায়ক লড়াইয়ে হেরে নিয়তিকে মেনে নিয়ে দলের সঙ্গে যাত্রা করে। উপস্থাপনায় গল্পটিতে ভিন্নতর স্বাদ এনে দেবার প্রচণ্ড সম্ভাবনা ছিল যা লেখক সদ্ব্যবহার করেন নি।

'দুই স্তরপতি'ই আমাদের খুব চেনা মানুষ। সংকলনের একটি ভাল গল্প। জনস্বার্থবিমুখ, আত্মমুখী গণপ্রতিনিধির চরিত্রটি তির্যক ভঙ্গিতে

লেখক প্রায় নিখুঁতভাবে এঁকেছেন। উপস্থাপনায় মুন্সিয়ানার ছাপ আছে।

'চিংড়ি' এই সংকলনের সবচেয়ে দুর্বল গল্প বলে মনে হয়েছে। গল্পটির বিষয় এবং উপস্থাপনায় আরও যত্ন নেবার প্রয়োজন ছিল।

'মিশ্রপিলু'তে ভিন্ন স্বাদ এনে দেবার প্রয়াস লক্ষণীয়। সঙ্গীতের বিস্তারের মতো আগাগোড়া গল্পটিতে নলিনাক্ষর চিন্তায় এক কাব্যিক ব্যঞ্জনা। আশেপাশের মানুষের সুখ দুঃখ জীবন সংগ্রামের ধারাবাহিকতা। কিন্তু সমাপ্তিতে (দশ বিশ পঞ্চাশ কি একশ বছরও লাগে শ্রুতিতে পৌঁছোতে, হয়ত এরই নাম ভবিষ্যৎ)। এই ধরণের নেতিবাচক উক্তি পাঠককে হতাশ করে।

মিশ্রপিলুর নৈরাশ্য কিন্তু 'আততায়ী' গল্প নেই। এ গল্পটিও সংকলনের একটি উৎকৃষ্ট সংযোজন বলে আমাদের মনে হয়েছে। শত্রুর গল্পের ত্রুটি এ গল্পে তিনি কাটিয়ে উঠে আসল আততায়ীকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। গল্পটি বলার ভঙ্গিও খুব সাবলীল।

'দীর্ঘ প্রতিচ্ছবি' মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের প্যানপ্যানে ছোটখাট চাওয়া পাওয়া, হিংসা আর ভালবাসার গল্প। বরঞ্চ এ গল্পে সেটা মারাত্মক মনে হয় তা হল একান্নবর্তী কবিতা ভেঙে যাবার প্রতি লেখকের যেন এক প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধ।

'পানশালা' গল্পটি ভাল তবে গল্পের শেষে ভুলোর খুন হয়ে যাবার অংশটি যেন হঠাৎই এসে পড়ে। গল্পের শুরুতে এই পরিণতির জন্যে একটু প্রস্তুতি থাকলে ভাল হত। তাছাড়া রিকশোআলা হলেই কি তাকে পানশালার সর্বক্ষণের সদস্য হতে হবে ? গল্পের নামটিও সুপ্রযোজ্য নয়। শেষ গল্প 'আইন-বেআইন'। বিষয় মামুলী। অনেক সময় এ ধরণের বিষয়কে উপস্থাপনার চাতুর্যে বিশেষ তাৎপর্য এনে দেওয়া যায়। কিন্তু এ গল্পে তেমন কোন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। বরঞ্চ বিষয়টা খুবই হাস্যকর ঠেকে তখনই যখন দেখি গল্পের নায়করা চোর। কাঠ চুরি করে রাতারাতি ঘর তুলছে। আবার আইনের রক্ষকরাও চোর, ঘুষ খাচ্ছে। তবে পাঠকের সহানুভূতি কার ওপর থাকা উচিত বলে লেখক আশা করেন ? কোন চোরের ওপর ?

পরিশেষে বলবো একজন প্রগতিশীল গল্পকার হিসাবে শ্রীচট্টোপাধ্যায়

ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর কাছ থেকে আরও উঁচু মানের লেখা পাবার প্রত্যাশা আমাদের রইল। ছাপা বাঁধাই মোটামুটি ত্রুটি-হীন, প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

—শৈলেন চৌধুরী

নির্বাচিত গল্প ঃ সাধন চট্টোপাধ্যায়, বুক মার্ক, ৬ বংকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩।

১৫

সাম্প্রতিককালে এই ধরণের ক্ষুদ্রায়ত গল্পসংগ্রহ বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদের মতো অফুরন্ত তৃপ্তির সাথে উপভোগ করা যায়। গল্পগুলির লেখক কেউ কেউ নবাগত, কেউবা দীর্ঘদিন লেখার মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। কিন্তু, প্রতিটি গল্প নিজস্ব মেজাজে অনবদ্য রুচীর তফাৎ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক গল্পকার তাদের গল্পে জীবন চর্চার এক পরিশীলিত আবেগ গেঁথে দিতে পেরেছেন, সেই কারণে গল্পগুলির এক সার্বিক আবেদন ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক এক শিল্প-সুষমায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

দীপক সরকারের গল্প। শুরুটা ছিলো অত্যন্ত personal অর্থাৎ গল্পের নায়ক যেভাবে ক্রমে ক্রমে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকায় নিজেকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। কখনো সে সামাজিক আবার কখনো সমাজ থেকে বিশ্লিষ্ট—মূল বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু একদিনের স্ট্রাইক,—গল্পকারের বা গল্পের নায়কের মূল (প্রধান) ঝোঁক স্ট্রাইকের সাথে সামিল হওয়া কিন্তু মধ্যবিত্ত আর একটি ঝোঁক (অপ্রধান) স্ট্রাইকের বিপক্ষে। যেখানে স্ট্রাইক সম্পর্কে সাধারণভাবে আপেক্ষিক কিছু মতামত আছে। কিন্তু গল্পটা একটা Ironyতে এসে পৌঁছায় যখন গল্পকার গল্পের শেষ ক'টা লাইনে ব্যক্ত করেন, 'পরের দিন কারখানার ভোঁ বেজে যাবার অনেক পরে বেলা করে ঘুম থেকে উঠল নিতাই'—গল্পটা এখানেই উত্তীর্ণ। স্ট্রাইকে সামিল হলো গল্পের নায়ক। সমস্ত vices-এর থেকে উত্তীর্ণ—এ যেন এক অগ্নিপরীক্ষা, গল্পটির আঙ্গিক মনকে ছুঁয়ে যায়।

জীবন সরকার একটু মেজাজে লেখেন। খুব সাদাসিধে সহজ আন্তরিক স্তরে কথা বলতে ভালোবাসেন। কখনো কখনো তার গল্পে নণ্টালজিয়া বেশী

পরিমাণ চেপে বসে, যে পরিবেশের সাথে আমরা একাত্ম না হলেও জীবন সরকারের গল্প বলার মুন্সীয়ানায় ভালো লাগে। জীবনবাবু কথায় ছবি আঁকেন। উপস্থিত গল্পতেও পূর্ব বাঙলার একটা সময়কে পাওয়া যাচ্ছে। যেখানে চিরন্তন হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় বিরোধ আছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বটা আজকের না। এই অপ্রধান ঝোঁককে নিয়ে তিনি যে গল্প লিখেছেন তাতে রসিদ ও বাসুর ব্যথা আমাদের (পাঠকের) হৃদয়কে ছোঁয়। কিন্তু রসিদ ও বাসুর এই মনোকষ্ট, যন্ত্রণা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, যদিও ধর্ম নিয়ে এই ধরণের প্রাচীর বর্তমান। 'প্রাচীর' গল্পে এই ধর্মগত অন্তরালের জন্য যে দুটি চরিত্রের মনোবেদনা আমাদের হৃদয়ের কাছে ছোঁয়, সেই দুটি চরিত্রের আন্তরিকতাই এই গল্পের উত্তীর্ণ হওয়ার চাবিকাঠি!

শিশির ভট্টাচার্য তার গল্পে মধ্যবিত্ত দম্ভকে চুরমার করে দিয়েছেন। যে সামন্তমশাইএর সাথে ট্রেনে আলাপ, তিনিই একটা গ্রামের বর্ধিষ্ণু চাষী। আমাদের শহুরে মানসিকতায় যে রকম ভাবে আমরা উপেক্ষা করি,—আমাদের যান্ত্রিক সভ্যতা যেভাবে আমাদের আচার আচরণও যান্ত্রিক করে তোলে, শিশির বাবুর গল্প এই দাম্ভিক শহর মানসিকতাকে একটা বড়ো রকমের ধাক্কা দেয়। সামন্তমশাই নির্দ্বিধায় যে অচল টাকাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন আমরা অভ্যস্ত অনায়াসে আমাদের চালাকির দ্বারা সেই অচল টাকাকেই সচল করে তুলতে পারি। মূলতঃ টাকাটা একটা প্রতীক হয়ে ওঠে—গ্রাম জীবনে যৌথ পরিবারভুক্ত একজন প্রতিবেশীসুলভ মনোভাবে আজকের দিনে একটা বিতর্কে নামে; যার প্রতীক সামন্তমশাই-এর নাতি। মূল্যবোধ পালটায়—নাগরিক শঠতা গ্রামকে গ্রাস করে—নাগরিক জীবনের চাতুর্য ক্রমে ধরা পড়ে যায়। শিশিরবাবুর গল্পে এই ধরণের ব্যঙ্গ মিশ্রিত প্রতিবাদ আছে বলেই গল্পটা আমাদের ভীষণভাবে টেনে রাখে।

শৈলেন চৌধুরীর গল্পও গ্রাম ছেড়ে আসা (হয়তো চাষী পরিবার) মানুষের। যারা শহরের ফুটপাতে একদিন আশ্রয় নেয়। ফুটপাত বাসিন্দা এই মানুষেরও একটা ইতিহাস আছে। কিন্তু গল্পটার বুনোন অনেকটাই রোমান্টিক যাতে—তাদের Existance-এর যে কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক, তা চিত্রায়িত করার গুণে সহানুভূতি কেড়ে নেয়। সন্ধ্যামণি যে সকলের থেকে একটু পৃথক তা গল্পের হিরোয়িন সাজানোর পক্ষে যথেষ্ট। সন্ধ্যামণির আশা-নিরাশার দোলায় আমাদেরও (পাঠকেরও) বুক কাঁপতে থাকে কিন্তু

গল্পের যে canvas তা থেকে ছিটকে পড়া একটা চরিত্র এই সন্ধ্যামণি। সন্ধ্যামণির ওপর বিশেষ গুরুত্ব (যা লেখকের রোমান্টিক ঘরানার জন্য) ফুটপাত বাসিন্দাদের মূল দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে পাঠককে উপস্থিত করতে পারেনি। তবুও গল্পটা ভালো লাগে।

সনৎ বসুর গল্প 'লাশ' একটা মৃতদেহের কাহিনী, যে মৃতদেহকে নিয়ে বিভিন্ন রকম গুঞ্জন। রাজনীতি নেতাদের ফয়দা লোটার চেষ্টা। শেষাবধি সেই 'লাশ' যেহেতু বেওয়ারিস সেইহেতু গোপন পথে চলে যায় ডাঃ সোমের চেম্বারে। কিন্তু ডাঃ সোমের চেম্বারে বিক্রীত হয়ে যাবার পরই সেই মৃতদেহ যেন একটা আলাদা চরিত্র পায়। লেখক অদ্ভুত মুন্সীয়ানায় ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পের এই অংশটুকু। মৃত ব্যক্তি ছিলো ক্ষয়রোগগ্রস্ত এবং খাদ্য কুখাদ্য ইত্যাদি অজীর্ণ অবস্থায় পাওয়া যার তার স্টমাকে। ওই সময়ে হাতের উল্কিতে একটা আইডেনটিফিকেশনও মেলে। সমস্ত গল্পটার পরতে পরতে বিদ্রূপ। লেখকের কলম শাণিত। স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন তার আয়োজন।

তাপস ভবাই তাঁর গল্পে (ভয়) মধ্যবিত্ত জীবনের এক নিপুণ আন্তরিক ছবি এঁকেছেন। মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিলো অবিনাশের। ভ্রম হয়েছিলো তার, হয়তো বা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছে অবিনাশ। পরে জানা গেলো তার রক্ত ওঠার কারণ ক্ষয়রোগ না। গল্পটা ট্রিটমেন্টের গুণে ভালো লাগে।

দীপক চক্রবর্তী 'মানুষটার জন্য' অন্য মেজাজের গল্প। একটি গ্রাম সরল হৃদয়ের নারী চরিত্রকে খুব বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন দীপকবাবু। যার 'মানুষটা'—ক্রোধের বশে খুন করেছে জোতদারকে,—তারপর সেই 'মানুষটার' জেল কিংবা মৃত্যু—যে আর কোনদিনই ফিরবে না; তার জন্য অনন্ত প্রতীক্ষা—খুব বিশ্বাসযোগ্য ছবি ফুটে উঠেছে, মানুষটার ফেরার জন্য কলমী শাক রেঁধে অপেক্ষা করছে রাধি। গল্প জুড়ে রাধির মর্মবেদনা আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

বক্তব্যের যে পর্যায়ে মধ্যবিত্ত আবেগ কাজ করে তা অতিক্রম করে নূতন এক আইডিয়ায় গল্প ফেঁদেছেন বাবলা চক্রবর্তী। এই ধরণের subjective গল্প চোখে আমার কম পড়েছে। জীবনের উপরিভাগ (বাইরের কাঠামো) নিয়ে গল্প বানানোর জন্য একটা নিরীহ ধরণের আন্তরিকতা হলেই যথেষ্ট। কিন্তু জীবনের objective দিককে (অর্থাৎ দ্বন্দ্বের বা Antithesis) তা

সামনে এনে মেলে ধরার জন্য যে ধরণের জীবনের ঘনিষ্টতা এবং জীবনের গভীরতায় পৌঁছানো দরকার বাবলা চক্রবর্তীর গল্পে সেই গুণগুলি আছে। তার এই ব্যঞ্জনা মৃদু করে—মনে হয় না imposed—একেবারে স্বাভাবিক, উদ্দেশ্যমূলক নয়—একজন যে মাছগুলো জীইয়ে রাখছে, সেই মাছগুলো অন্য একজনের পোষা কেউটের খাদ্য—'সংসার আগে না দেশ আগে' এই প্রশ্নতে অন্য একজনের মন মথিত। গল্পটায় এই তিনটি চরিত্র বক্তব্যায়ণে আনুপূর্ব জীবনের একটা সমগ্র পরিধি ধরা পড়েছে।

সবশেষে এই সংকলন করার জন্য সুসম্পাদক ভবানী মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। তিনি কিছু শক্তিশালী গল্প ও গল্পকারকে উপস্থিত করতে পেরেছেন। সম্পাদককে ধন্যবাদ।

—শিশির সামন্ত

সাম্প্রতিক গল্প সংগ্রহ ঃ সম্পাদক—ভবানী মুখোপাধ্যায়। মূল্য ঃ ৬ টাকা। প্রকাশক ঃ ৬১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩।

১৬

আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের প্রথম প্রবন্ধের বই। এই গ্রন্থে তিনি যে বিষয় নিয়ে আলোচনার অবতারণা করতে চেয়েছেন তা বহুবিতর্কিত এবং বহু আলোচিত। বিষয়টা হল লেখালিখি। অর্থাৎ লেখক এবং তাঁর লেখা। স্বভাবতঃই লেখক এই গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন লেখার আগেই লেখককে ভাবতে হবে তিনি কেন লিখবেন এবং সেই লেখা কার প্রয়োজনে লাগবে। এবং এইখানেই সেই বহু চর্বিতচর্বিত কথাগুলো এসে পড়ে। 'শিল্প শিল্পের জন্য' না 'শিল্প জনগণের জন্য'। গ্রন্থলেখক দ্বিতীয় দর্শনে বিশ্বাসী। তাই তিনি দৃঢ়ভাবে প্রথম মতবাদকে নস্যাৎ করেছেন। তাঁর চুলচেরা বিশ্লেষণ থেকে বাংলা সাহিত্যের পূর্বসূরীরা বাদ যান নি। বাদ যান নি বর্তমানের বহু বিজ্ঞাপিত অজস্র প্রসবকারী লেখক নামধারী ভণ্ডের দল। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, মানিক, সুকান্তর উপর তাঁর যুক্তিনির্ভর আলোচনায় পাঠক এমন অনেক জিনিস পাবেন যা তাদের ক্ষেত্রে চিন্তার নতুন দ্বার খুলে দেবে।

লেখকের দৃঢ়বিশ্বাস সাহিত্যিককে মানুষের কাছে দায়বদ্ধ হতে হবে।

প্রয়োজনে হতে হবে শ্রেণীচ্যুত। তাঁর মতে জনগণের প্রকৃত লেখক তিনিই যিনি তাঁর সামাজিক অবস্থানকে উপেক্ষা করে সর্বহারার সংগ্রামে তাঁর কলমটি দান করতে পারবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মার্কস, লেনিন, মাও-সে-তুং-এর উদ্ধৃতিগুলি বক্তব্যের পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপিত।

গ্রন্থলেখক অবশ্য শিল্পের শিল্পগুণে যাতে খামতি না থাকে সেদিকে লেখকদের অবশ্যই নজর দিতে বলেছেন। যে ধরণের রচনাই হোক না কেন শিল্পগুণে সমৃদ্ধ না হলে তা কখনও মহান সাহিত্যের মর্যাদা পায় না।

লেখক, লেখকের রচনা, রচনার বিষয়বস্তু, ভাববস্তু, আঙ্গিক, নান্দনিক দিক—ইত্যাদির বিশাল পরিব্যাপ্তি ক্ষুদ্র এই গ্রন্থে টেনে আনা অতি দুরূহ কাজ। বলতে দ্বিধা নেই লেখক সেই আয়াসসাধ্য কাজটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। সচেতন ও চিন্তাশীল পাঠক এবং নতুন প্রজন্মের লেখকদের এই বইটি পড়া উচিত বলে মনে করি।

—হারান মাঝি

প্রসঙ্গ লেখালেখি। দীপক সরকার। ক্ষণিক প্রকাশ। ৫০ পয়সা।

১৭

অপরাজিতা গোপ্পীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অরণ্য গভীরে'। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আহত পাখির মত ডানা ঝাপটায়' বেরোবার আট বছর পরে বেরোলো দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। দীর্ঘ আট বছরে কবির মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। কবি হিসেবে হয়েছে আরও প্রতিষ্ঠা। অপরাজিতা দেবী শুধুমাত্র রাজনীতি সচেতন কবিই নন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তাই তাঁর কবিতায় রাজনীতি সচেতনতার প্রকাশ ঘটছে কবিতার প্রতিটি ছত্রে। কবির সবচেয়ে ভালো দিক হলো যে তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁর রাজনৈতিক সত্তা কবি সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি। তাঁর কবিতা শ্লোগান হয়ে ওঠেনি। কবি যেমন রাজনীতির দিকে সচেতন তেমনি তিনি সচেতন কবিতার শৈল্পিক দিকের প্রতি। আঙ্গিকের দিকে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও তাঁর শিল্পীমনকে তিনি রাজনৈতিক শ্লোগানে বিসর্জন দেননি। তাই রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী হয়েও যে একজন সত্যিকারের

কবি হওয়া যায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপরাজিতা গোপ্পী।

বর্তমান কাব্যগ্রন্থে কবির বাইশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। আমরা ধরে নেব যে প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর থেকে দীর্ঘ আট বছরে লিখিত কবিতা-বলীর কবি কর্তৃক নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন। কবিতা নির্বাচনে কবি একটা কথাই প্রমাণ করেছেন যে তিনি বস্তুবাদী। ভাববাদের মোহ কাটিয়ে বস্তুবাদের প্রতিই তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। প্রতিটি কবিতায় তিনি একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থার অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপকে যেমন তিনি প্রকাশ করেছেন, তেমনি এই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা করার পথের সংকেত দিয়েছেন। উত্তরণের রাস্তা দেখিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, যখন 'প্রেম-ভালবাসা, বিদ্রূপের/মত কটাক্ষ করে, তখনও আমি/নিঃসঙ্গ মাঠের বুকে দাঁড়িয়ে, / অন্ধকার আকাশে, / ধ্রুবতারকা খুঁজে নিতে চাই /' কবি চেয়েছেন, 'কঠিন পৃথিবীর বুকে / ভালবাসার পাপড়ি মেলে/জীবন্ত হয়ে উঠতে। কাব্যগ্রন্থটির সমস্ত কবিতাগুলো জুড়ে কবির পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। বস্তুবাদী কবির সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তিনি। শিক্ষক শঙ্করবাবুর মৃত্যুতে লেখা কবিতা 'সাগর দীঘি তুমি পথিকৃৎ' বর্তমান কাব্যগ্রন্থে কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে কবির বিদ্রোহী সত্তা। যে বিদ্রোহী সত্তা সাগরদীঘির আকাশ ঘিরে 'বিদ্রোহের আগুন/তোমার তপসী-বকুল ফুলের মাঠে/পলাশ রাঙা আগুন/ বার বার বিদ্রোহের/অগ্নিশিখায়/জ্বলে উঠবে।' বর্তমান সমাজব্যবস্থার কুটিলতা শোষণ-নির্যাতনের রূপ কবির চিন্তকে ব্যথিত করে তোলে। মানুষের সৃষ্টিকরা কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের বলি হয় অসহায় মানুষ। কবির লেখনী তখন থেমে থাকে না। নীরবতা অবলম্বন না করে বলে ওঠেন, 'শোষণের ষড়যন্ত্রে, ক্ষমতার দম্ভে/বঞ্চনার বিষে, অসহায় মানুষের/জীবন ঘিরে/করে আর্তনাদ/এখানে মৃত্যুমিছিলে,/প্রত্যাশিত সূর্যরশ্মি/কফিনের আড়ালে/বারবার হারিয়ে যায়/।' বর্তমান সমাজের এই নির্মম চিত্র যেমন কবিকে ভাবায়, তেমনি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন সুন্দর এক অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্নে। যেখানে 'সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন পৃথিবীতে/উপেক্ষিত, উপবাসী মানুষের মিছিল/ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলে, / দূরাগত সমুদ্রগর্জন / আসন্নপ্রসবা পৃথিবীতে/জন্ম দেয়/নতুন ভ্রূণের/।' কবি যে-কথা বিশ্বাস করেন সে-কথা

ঘোষণা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। এই সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন সমাজ গঠনের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, 'আমরা আজ দৃঢ় হতে চাই।/ আমরা আজ ঘরে ঘরে ধনঞ্জয়/সৃষ্টি করতে চাই।' আধুনিক কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে নতুন ধর্মযুদ্ধের আহ্বান যেন আমরা শুনতে পাই, 'বন্ধু আজ আর শোক নয়,/আজ শুধু প্রতিজ্ঞা/প্রতিশোধ।' গ্রন্থটির শেষ কবিতাটির নামেই কাব্যটি নামকরণ করেছেন কবি। যেন এই কবিতাটিতে তিনি বলতে চেয়েছেন তাঁর অন্তরের মর্মবাণীটিকে। ধ্বংসের পরে আসে সৃষ্টি। অসুন্দরকে সরিয়ে দিয়ে সুন্দরের আগমন। তাই কবি যখন সমস্ত গ্রন্থটি জুড়ে অসুন্দরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন—নতুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ঘরে ঘরে ধনঞ্জয় সৃষ্টি করতে চান তখন তিনি অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের সুন্দর ছবিটি না এঁকে তাঁর কাব্যগ্রন্থটিকে শেষ করতে পারেন না। 'ওখানে/রাত্রির আকাশ ঘিরে/নক্ষত্রের আলো ঝরে,/পলাশের রক্তিম বুকে। নক্ষত্র ঝরে ঝরে/জন্ম দেয় অনাস্বাদিত/একটি ভালবাসার,/যে শিল্পী শুধু বাস্তবের চিত্রই শৈল্পিক দৃষ্টিতে আঁকেন না, ভবিষ্যতের সুন্দর জীবনে উত্তরণের পথও দেখান তিনিই সঠিক অর্থে সার্থক বস্তুবাদী শিল্পী।

কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলিতে আঙ্গিকের দিক থেকে ত্রুটি কিছু কিছু আছে। অনেক ক্ষেত্রে কবিতাগুলো সঠিক অবয়ব লাভ করতে পারেনি ঠিক; কিন্তু দুর্বোধ্য ভাষার আড়ালে কবি নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা না করে সর্বজন-গ্রাহ্য ভাষায় কবিতা লেখায় কবি নিশ্চয়ই জনতার কবি হওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন। ছন্দের দিকে একটু নজর দিলে কবি হয়তো ভালো করবেন। কারণ, পরিপূর্ণ ছন্দজ্ঞান না থাকলে গদ্যকবিতা রচনা প্রায় অসম্ভব।

কাব্যগ্রন্থটির প্রচ্ছদপট সুন্দর। মুদ্রণের সামান্য কিছু ত্রুটি থাকলেও কাব্যগ্রন্থটি একটি সৌষ্ঠবপূর্ণ প্রকাশনা। "প্রকাশক" সংস্থাকে এই গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

—দীপক চক্রবর্তী

অরণ্য গম্ভীরে/অপরাজিতা গোস্বামী। প্রকাশক: ৬০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি-৯। দাম: ৮ টাকা।

কবি পরিচিতি

শিলঙ্

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত: পঞ্চাশের বিশিষ্ট কবি। দীর্ঘদিন তিনি শিলঙে ছিলেন। যুক্ত ছিলেন শিলঙের প্রতিটি পত্র-পত্রিকার সঙ্গে। যদিচ তিনি কোনো পত্র-পত্রিকার ভিতরে আসতে নারাজ; তবু, শিলঙের কাব্যে সহৃদয় সাহায্য করেছেন বীরেন্দ্রনাথ। 'শিলঙের কবিতা' বের হবার দশ বারো বছর আগে (সম্ভবত ১৯৫৬ সালে) 'উৎস' নামে একটি সাইক্লোস্টাইলড কবিতার কাগজ শিলঙ থেকে বেরিয়েছিলো। এই পত্রিকাটির অন্যতম কবি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। তিনি শিলঙ থেকে প্রকাশিত 'পূর্বভারতী' (১৯৬৯-৭০) সাহিত্য পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথের প্রথম ও একমাত্র কবিতার বই 'পরবাসী'। পঞ্চাশের যে ক'জন কবি বাংলা কবিতার ছন্দে, আত্মা ও শরীরে নতুনতর এনেছেন ইনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর চিত্রকল্প ব্যবহারের বাহাদুরী, ছন্দ-নিপুণতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বহু তরুণ কবিকে মুগ্ধ করে। তাঁর আশ্চর্য সুন্দর চিত্র-কল্প উল্লাসিত করে হৃদয়।

বীরেন্দ্রনাথের কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগও আছে—অভিযোগ একটিই দুর্বোধ্যতা। তাঁর কবিতার সংকলন বেরুনো আশু প্রয়োজন বাংলা কবিতার বৃহত্তর স্বার্থে।

রমানাথ ভট্টাচার্য: "শিলঙের কাব্য আন্দোলনের পুরোধা। তাঁরই গভীর উৎসাহ-উদ্যমে ১৯৬০ সালের ১৭ নভেম্বর শিলঙ থেকে প্রথম মুদ্রিত কবিতার কাগজ 'শিলঙের কবিতা' বের হয়। পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন তিনি ও শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য।" কাগজটি দেশ, যুগান্তর, হিন্দুস্থান স্টানডার্ড

ও অন্যান্য দু'তিনটি কাগজে আলোচিত হয়। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা সম্বন্ধে অমৃত লেখে, "বাংলা কবিতা আন্দোলনে 'শিলঙের কবিতা' স্বাক্ষর রাখতে পারবে আশা করি।" শ্রদ্ধেয় বিষ্ণুদে-র কাছ থেকেও 'শিলঙের কবিতা' অভিনন্দন পেয়েছিলো।

পূর্বাঞ্চলের যে পনেরো-ষোলোজন কবি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অমিতাভ চৌধুরী একবার 'আনন্দবাজার'-এ লিখেছিলেন কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখছেন বলে রমানাথ ভট্টাচার্য (বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ও পীযূষ ধর) তাঁদের অন্যতম।

"রমানাথ প্রধানত রোমান্টিই কবি। দীর্ঘদিন প্রেম ও প্রকৃতি নিয়ে কবিতা লিখছেন। বিচিত্র ছন্দে, চিত্রকল্পের ঐশ্বর্যে, সাবলীল ভাষায় তাঁর আত্মপ্রকাশ। শব্দের মারপ্যাঁচ নেই তার কবিতায়, আছে তাঁর সহজ সাবলীল ব্যবহার, অথচ এই ব্যবহার কবিতায় অনায়াসে এনে দেয় গভীরতা আর যথার্থ অর্থে আধুনিকতা।"

রমানাথের শব্দ ব্যবহার কখনো কখনো একটু-আধটু রাবীন্দ্রিক বা জীবনানন্দীয় স্মৃতিবাহী। বাংলা কবিতার বহত্তর স্বার্থে রমানাথ রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের স্মৃতিকণা ঝেড়ে ফেলুন হৃদয় থেকে।

দীর্ঘদিন রমানাথ ভট্টাচার্য 'ঋতুরঙ্গ' (১৯৭১) নামে একটি উৎকৃষ্ট কবিতার কাগজ সম্পাদনা করছেন। এইটিই শিলঙের একমাত্র কবিতার কাগজ; তাই শিলঙের কাব্য-আন্দোলনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। শিলঙের ও পূর্বাঞ্চলের প্রায় সব কবিই এই কাগজে লিখে থাকেন। পত্রিকাটি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র দেশমুখ্য, অশোক বিজয় রাহা, শিশির ভট্টাচার্য প্রশংসা করেছেন।

নিতাইপদ ভৌমিক : শিলঙের কাব্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বহু পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখছেন। সম্ভবত এখনো কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

পীযূষ ধর : শিলঙের কাব্য আন্দোলনে পীযূষ ধরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'শিলঙের কবিতা'-র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন তিনি। পাঁচ ছয় বছর ধরে 'পাহাড়িয়া' নামে সাহিত্যের কাগজ সম্পাদনা করছেন। শিলঙের কবি-লেখক পত্রিকাটিতে সর্বদা সমাদৃত। শিলঙের কাব্য-আন্দোলনের অবদান বেশ উল্লেখযোগ্য।

কাগজটির সাম্প্রতিক সংখ্যা দুটি বেশ উন্নত মানের।

পীযূষ ধরের কবিতায় শব্দ ব্যবহার কখনো কখনো আশ্চর্য রকমের সুন্দর। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত 'ঋতুরঙ্গ'-এ তাঁর কবিতার বই 'নীল সাগরের পারে'-র আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "যে কবি দু'ফর্মার ছোট্ট বইয়ে অন্তত গোটা দশেক কবিতাকে উল্লেখযোগ্য করে তোলেন, তিনি নিঃসন্দেহেই প্রতিশ্রুতিবান।" তাঁর দ্বিতীয় বই 'অলিন্দে সূর্যের হাওয়া' (অন্য তিনজন কবির সাথে)-র 'অশুচি আশ্লেষে' কবিতাটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো কবিতা।

বহুদিন পীযূষ ধরের প্রথম বই বেরিয়েছে, দ্বিতীয় বইও বেরিয়ে গেছে। এখনো তাঁর কবিতার ছন্দ ও ভাবনা কিছু এলোমেলো। এই এলোমেলো ভাব কাটিয়ে উঠলে তাঁর কবিতা একটা বিশেষ স্থান করে নেবে এতে কোনো সন্দেহ নাই।

শংকর চক্রবর্তী : শিলঙে এলেন ১৯৭২ বা ১৯৭৩ সালে। তখন থেকেই তিনি সাহিত্যের কাগজ 'শতাব্দী' বের করছেন। কাগজটি কখনো শিলঙ কখনো পাটনা কখনো কলকাতা থেকে বেরিয়েছে। কলকাতার নামী-দামী কবি লেখকরাই সাধারণত এই পত্রিকায় লিখে থাকেন—শিলঙের কবি লেখকরা এই কাগজে দারুণভাবে অনুপস্থিত। তাই শিলঙের কাব্য-আন্দোলনে এই 'অস্থির' পত্রিকাটির ভূমিকা খুব উল্লেখযোগ্য নয়।

কবিতায় শংকরের শব্দ ব্যবহার ভালো রকমের আধুনিক। প্রতীক ব্যবহারেও শংকর নিপুণ, বহু ভালো চিত্রকল্পও আছে তাঁর কবিতায়। তবে তাঁর কবিতায় ছন্দের বিচিত্রতার অভাব কখনো কখনো ছন্দের আড়ষ্টতাও ধরা পড়ে তার কবিতায়, ভাবনা ও কখনো কখনো ঝাপসা লাগে। তবে তাঁর 'টুকুনের মুখ' খুব ভালো একটি কবিতা। কবিতাটির জন্য তাঁকে নিঃসন্দেহে সাধুবাদ দেওয়া যায়।

শংকরের প্রকাশিত কবিতার বই 'এক আকাশ' (সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে) আর 'পঞ্চশর' (অন্য চারজন কবির সাথে)।

রণবীর চক্রবর্তী : 'শিলঙের কবিতা'র সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। বাস্তবতা তাঁর কবিতার ভিত্তি। দীর্ঘদিন ধরে লিখছেন। তবে কবিতার ভাষা ও ভাবনার কোনো পরিবর্তন আসেনি। আসলে রণবীর কবিতাকে

সিরিয়াস্‌লি নিতে পারেন নি। এখন প্রধানতঃ 'পাহাড়িয়া'-য় লিখেন।

করুণাকান্তি দাশ ঃ মিষ্টি হাত। প্রধানত 'ঋতুরঙ্গ', 'পাহাড়িয়া' ও শিলচরের কাগজ 'শতক্রতু'-তে কবিতা লিখেছেন। 'কৃত্তিবাস'-এ তাঁর কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার ভাবনা খুবই সীমিত বৃত্তের ভিতরে ঘুরোঘুরি করে। সম্প্রতি কোনো পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা চোখে পড়ে না। করুণাও কবিতাকে সিরিয়াস্‌লি নিতে পারলেন না।

অরুণ চন্দ ঃ প্রধানত 'ঋতুরঙ্গ', 'পাহাড়িয়া' ও 'শতক্রতু' পত্রিকায় লিখেন। ছন্দে ভালো হাত। তবে কোনো কোনো কবিতায় শব্দ ব্যবহারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রভাব বড়ো প্রকট।

পরিমল চৌধুরী ঃ নতুন লিখছেন। 'শতাব্দী', 'পাহাড়িয়া,' 'শতক্রতু'তে লেখা প্রকাশ পেয়েছে।

চিন্ময় দে ঃ নতুন লিখছেন। 'পাহাড়িয়া' ও 'ঋতুরঙ্গ'-এ কবিতা লিখেছেন।

মুজাহিদ আহম্মদ ঃ নতুন কবি। মিষ্টি হাত। 'অমৃত', 'ঋতুরঙ্গ', 'পূর্বায়ন'-এ কবিতা লিখেছেন। অন্য কোথাও লেখা চোখে পড়ে না।

হোসেন আহম্মদ নুড়ি ঃ নতুন কবি। মিষ্টি হাত। 'পাহাড়িয়া' 'পূর্বায়ন' 'উদাসীন' (অধুনালুপ্ত একটি সংখ্যা বের হবার পরই) প্রভৃতি পত্রিকায় লিখেছেন। ইদানীং পত্র-পত্রিকায় লেখা চোখে পড়ে না।

১. 'অর্ক' পত্রিকা আয়োজিত কবিসভা

এক ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে 'অর্ক' পত্রিকার কবিসভা সুসম্পন্ন হল ৫৯নং দেব লেন, কলকাতা-২৪-র পত্রিকা দপ্তরে। আন্তরিক পরিবেশে কবিতা পাঠ করলেন—শিশির ভট্টাচার্য, শান্তনু দাস, জীবন সরকার, অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ সিংহ, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। আধুনিক কবিতা আবৃত্তি করে শোনান মিনতি দে। পরে স্বরচিত কবিতার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন—শ্রীবিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। শেলী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেদগান সূচনাপর্বেই সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন শিখা চন্দ। সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে চা পানে আপ্যায়িত করেন।

২. ভারতীয় ভাষা পরিষদের সাহিত্যসভা

সম্প্রতি ভারতীয় ভাষা পরিষদের মঙ্গলগোষ্ঠী আয়োজিত একটি সাহিত্য সম্মেলনে গল্প পাঠ করলেন জীবন সরকার।

৩. গল্পগুচ্ছ পত্রিকার উদ্যোগে সাহিত্যসভা

গল্পগুচ্ছ পত্রিকার উদ্যোগে মহাজাতি সদনের সাহিত্য বাসরে গল্প পাঠ করলেন শৈলেন চৌধুরী।

৪. একক পত্রিকার কবি সম্মেলন

কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'একক' পত্রিকার উদ্যোগে সম্প্রতি বিরাট এক কবি সম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলনে কবিতা পাঠ করলেন সুশীল রায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শিশির ভট্টাচার্য, সুব্রত রুদ্র, নির্মল বসাক, নিখিলরঞ্জন মাইতি, ডলি দত্ত, স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়, অভিজিত ঘোষ এবং আরো অনেকেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশংকর রায় উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর বাংলার কবি সতী সেনগুপ্ত ময়নাগুড়িতে থাকেন। সম্প্রতি তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। তিনি কলকাতার সাহিত্যিক ও কবি বন্ধুদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেন্স, কল-৪৫
Collection : KLMLGK	Publisher : নির্মলেন্দু চৌধুরী
Title : অন্যদিন (ANYADIN)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 27/2 29-30	Year of Publication : অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১৩৮৭ (1980) Dec - March 1982
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : নির্মলেন্দু চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অন্যদিন

কবিতাকেন্দ্রিক সাহিত্যপত্র

সম্পাদক
শিশির ভট্টাচার্য

শীত-বসন্ত সংখ্যা ১৩৮৮ ● উনত্রিশ-ত্রিশতম সংকলন

অন্যদিন

অবৈতনিক সম্পাদক : শিশির ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক : জীবন সরকার

অন্যদিন প্রধানত তরুণ গোষ্ঠীর ত্রৈমাসিক কবিতাকেন্দ্রিক মুখপত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জীবনধর্মী গল্প, কবিতা ও আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে। চিঠির উত্তর পেতে হলে অনুগ্রহ করে ডাকটিকিটযুক্ত নাম ঠিকানা লেখা খাম পাঠাবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, ক'লকাতা-৪৫ ফোন : ৪২-৪৪৮০।

সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, ক'লকাতা-৬ থেকে হরিপদ পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও শিশির ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস ক'লকাতা-৪৫ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ শিল্পী : কমল সাহা, প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ইম্প্রেশন হাউস : ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, ক'লকাতা-৯

দাম : আড়াই টাকা

শীত-বসন্ত সংখ্যা ১৩৮৮
সংকলন ২৯-৩০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র • কলিকাতা-৭০০ ০০৯ •

অন্যদিন

প্রবন্ধ

অর্ণব সেন * চিত্রা দেব

গল্প

কণাবসু মিশ্র * এ. মান্নাফ * সন্তোষ মণ্ডল

কবিতা

অপরাজিতা গোপ্পী * অভিজিৎ ঘোষ * অমিয়কুমার সেনগুপ্ত * অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় * অরুণাভ ভৌমিক * অর্ধেন্দু চক্রবর্তী * আজিজুর রহমান মোমিন * আনওয়ার আহমদ * ওয়াজেদ আলি * কঙ্কন নন্দী * কবিরুল ইসলাম * কেদার ভাদুড়ী * জগন্ময় মজুমদার * তাপস ভট্টাচার্য * দীপক কর * নন্দলাল সেনগুপ্ত * নিখিলরঞ্জন মাইতি * নির্মল তেওয়ারী * নীতিশ বসু * প্রবীর ঘোষরায় * বরুণ মণ্ডল * বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায় * বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায় * বীরেন সাহা * মনোজ রাউত * রঞ্জতশুভ্র গুপ্ত * রথীন্দ্র রায় * রায়হান রাহমান * লালী বন্দ্যোপাধ্যায় * শংকরজ্যোতি দেব * সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য * সুনীল শর্মাচার্য * সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় * সুব্রত রুদ্র * সোফিওর রহমান * সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় * সৈয়দ কওসর জামাল * সৈয়দ হাসমত জামাল * স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদেশী ভাষা থেকে

ফিলিপিন্স

সুলতান জামালুল কিরাম-তৃতীয়
অনুবাদ ঃ অমিতাভ চক্রবর্তী

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে

মারাঠী

মৃণালিনী কেলকার
অনুবাদ : জীবন সরকার

বিশেষ আলোয়

শিশির ভট্টাচার্য

আলোচনা

সুশীল রায় * সন্তোষকুমার অধিকারী * শিশির ভট্টাচার্য * অভিধান বন্দ্যোপাধ্যায় * সৈয়দ কওসর জামাল * দেবকুমার মুখোপাধ্যায় * চিত্রভানু সরকার * সুতপন চট্টোপাধ্যায় * অমিত কাশ্যপ * পূর্ণেন্দুশেখর পণ্ডিত * জীবন সরকার * নির্মল বসাক * দীপক সরকার * শৈলেন চৌধুরী * শিশির সামন্ত * দীপক চক্রবর্তী * হারান মাঝি।

কবি-পরিচিতি

শিলঙ

কবিতার খবর

উত্তরের সাহিত্যচর্চা

অর্ণব সেন

খাস ইংরেজি সাহিত্যের আসরে 'উপেক্ষিত' আইরিশ ও স্কটিশ লেখকদের যে দশা, বাংলা সাহিত্যের আসরে উত্তর বাংলার লেখকের সেই দশা। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় ৭৫ লক্ষ মানুষের বাস। কলকাতাসহ বাকি পশ্চিম বাংলার সঙ্গে এই পাঁচটি জেলার মানসিক দূরত্ব ভৌগোলিক দূরত্বের চেয়েও অনেক বেশি। এইজন্যই বোধহয় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'একালের গদ্য-পদ্য আন্দোলনের দলিল' নামক বইখানিতে রবীন্দ্র পরবর্তী তিরিশ বছরের লেখালিখির দলিল রচনা করতে গিয়ে সত্য গুহ লেখেন ঃ 'উত্তর বাংলা এবং আসামের দূরাঞ্চলের বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্যে কবিতা চর্চা করে যাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, রুচিরা শ্যাম, রঞ্জিৎ দাশ ইতিমধ্যেই উল্লেখের দাবী রাখে।' [পৃঃ ৩৫৩] এই মন্তব্যটি পাঠ করলেই বোঝা যায় ১৯৭০ সালেও সত্য গুহের কাছে উত্তর বাংলা কত অপরিচিত ভূমি ছিলো। অথচ সত্য গুহ পত্র-পত্রিকার পাহাড়ের ওপর শুয়ে থাকতেন, 'শুধু শুয়েই থাকেননি তিনি ডুবে যেতে চেয়েছেন। ডুবেছেনও।' (ব্যাক কভার) কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সত্য গুহের বিশাল গ্রন্থটিতে প্রায় হাজারের কিছু কমবেশি লেখক আলোচিত হলেও উত্তর বাংলার পাঁচটি জেলার সাহিত্যচর্চার অংশীদারদের কথা অনালোচিত থেকে গেছে। উত্তর বাংলাকে আলাদা করে দেখার প্রশ্ন আসে না, কিন্তু ১৯৭০ সালেও উত্তর বাংলায় অন্তত পঞ্চাশজন মাঝারি ধরনের লেখক-লেখিকা ছিলেন যাঁরা প্রায়ই কলকাতার পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। ছিলো বছরে শতাধিক লিটল ম্যাগাজিন, যেগুলো স্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে কলকাতায় পৌঁছতো। এ ভাবেই দেখা যায় বেণু দত্তরায়, শিশির ভট্টাচার্য,

সমীর চক্রবর্তী (একটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি কাব্যনাট্য আছে) ষষ্ঠী বাগচী, জীবন সরকার, বিমল ঘোষ (চোমং লামা), হরেন ঘোষ, শক্তি ঘোষ, ইত্যাদি বেশ কিছু নাম বাদ পড়ে যায়। আলোচিত হন না প্রবন্ধকার অশ্রুকুমার সিকদার, অবশ্য অমিয়ভূষণ মজুমদার, কার্তিক লাহিড়ী, সুরজিৎ বসু, রণজিৎ দেব, অরুণেশ ঘোষ, সুব্রজিৎ দাশগুপ্ত, দেবেশ রায় কয়েকজন প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছেন।

আসল কথা, উত্তর বাংলার লেখক-লেখিকাদের সম্পর্কে কলকাতার পত্র-পত্রিকার জগৎ, সাহিত্যের জগৎ তেমনভাবে অবহিত নন। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র শহর কলকাতা। এই শহরের সঙ্গে উত্তর বাংলার কবি ও লেখদের সম্পর্ক ঘটনাচক্রে তেমন নিবিড় নয়। আজ থেকে পঁচিশ বছর বা কুড়ি বছর আগে ডাকে পাঠানো লেখা কলকাতার পত্র-পত্রিকার সম্পাদক খুলে দেখতেন, পড়তেনও (অবশ্য সব সময় নয়), কিন্তু সেদিন আর নেই ! দেবেশ রায়ের লেখা ডাকে পাঠালে 'দেশ'-এ বেরিয়েছিল তাঁর কলেজ জীবনে, এমন সৌভাগ্য অনেক উত্তর বাংলার লেখকেরই হয়েছে। কিন্তু এখন দিনকাল বদলে গেছে।

কলমের জোর থাকলে কলকাতার সাহিত্যের জগতে নিজের জায়গা করে নেওয়া যায়—এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু তার জন্য দরকার, উত্তর বাংলা ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকা, যা উত্তর বাংলার এককালের বাসিন্দা এখনকার সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকরা করেছেন। উত্তর বাংলায় থেকে কবিতা ছাড়া অন্য দীর্ঘ গদ্য রচনা নিয়মিতভাবে কলকাতার পত্র-পত্রিকায় বেরোতে পারে না। এখন অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই গোষ্ঠীনির্ভর, তা ছাড়া ছাপার জগৎ এখন অনেক সংকীর্ণ এবং দুর্মূল্য, লেখক-লেখিকার সংখ্যাও বহু। এক্ষেত্রে কলকাতার লেখক-লেখিকাদের প্রতিদিনের সাক্ষাতের পরিচিতি বাদ দিয়ে ডাকে পাঠানো মফঃস্বলের লেখা, বিশেষ করে গদ্য লেখা কদাচিৎ উপযুক্ত মর্যাদা পেতে পারে। যোগাযোগ ছাড়া উত্তর বাংলার মফস্বলী লেখকের লেখা এই বাস্তবতার যুগে দৌড়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। এই রূঢ় সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই।

তাছাড়া উত্তর বাংলার একজন তরুণ কবি বা গল্পকারের পক্ষে কলকাতার অবহেলার বিরুদ্ধে কতদিন লড়াই করা সম্ভব আমি জানি না। তবে এই জন্যই উত্তর বাংলার অনেক সম্ভাবনাময় তরুণ কিছুদিন লেখালেখির পর

মফস্বলী হতাশার শিকার হয়ে লেখা ছেড়ে দেন। সকলে তো অমিয়ভূষণ মজুমদার, অশ্রুকুমার সিকদার বা দেবেশ রায় হতে পারেন না। অবশ্য দেবেশ রায়ও কলকাতাবাসী হয়েছেন কয়েক বছর হলো।

সম্প্রতি উত্তর বাংলা থেকে একটি দৈনিকসহ বেশ কিছু পত্রপত্রিকা বেরোচ্ছে, উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রেরও অভাব নেই। মুদ্রণশিল্পের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে থেকেও উত্তর বাংলার পত্র-পত্রিকাগুলির উদ্যোগ এবং উদ্যমের অভাব নেই, কিন্তু অভাব হয় ভালো লেখার। উত্তর বাংলার প্রতিষ্ঠিত লেখকরা ভালো লেখা কলকাতার কাগজের জন্য তুলে রাখেন। একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক বলেছেন : 'আমি লিখি কম, উত্তর বাংলার কাগজের প্রচার কই ? এখানে লেখা দিয়ে আমি লেখাটা নষ্ট করবো কেন ?' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবু বেশ কিছু ভালো লেখা উত্তর বাংলার লিটল্ ম্যাগাজিন-গুলোয় থাকে।

উত্তর বাংলার পাঁচটি জেলা থেকে বছরে এখন প্রায় শতাধিক পত্র-পত্রিকা বেরোচ্ছে, উত্তর বাংলার কবির সংখ্যা মোটামুটি পঁচিশের কাছাকাছি, গল্প-কারের সংখ্যা একশোর কম বা বেশী, উপন্যাস বা বড়ো গল্প লিখিয়েও আছেন ক'জন। রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বালিয়াগঞ্জ, মালদহ, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, দিনহাটা, আলিপুর দুয়ার, ধূপগুড়ি, দার্জিলিং, বা কালিম্পং—উত্তর বাংলার আরো অনেক ছোটো জায়গাতেও পত্র-পত্রিকার নানা গোষ্ঠী, নানা মতাদর্শ। এর ভালোমন্দ—দুটো দিকই আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, উত্তর বাংলার দুটি খণ্ড, পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদহ আর দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার—এই দুই উত্তর বাংলার মধ্যেও সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়, যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হওয়া দরকার।

উত্তর বাংলার পাঁচটি জেলা থেকে বেশ কিছু লেখক-লেখিকা বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব স্থান দখল করেছেন, একথা যেমন সত্য, তেমনি বাংলা সাহিত্যের এই শতাব্দীর বৃহত্তর সাহিত্যের আন্দোলনে উত্তর বাংলার কবি ও লেখকের কোনো মৌলিক অবদান ছিলো কিনা, বা কতোটুকু ছিলো তা বিচার করা দরকার। নকশালবাড়ির রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া উত্তর বাংলা সাহিত্যের আন্দোলনে চিহ্নিত হলো না কেন—এই অগৌরবের দায়িত্ব বোধহয় আমাদের সকলের। আসলে কলকাতাতেই এই শতাব্দীর সাহিত্যের বলিষ্ঠ আন্দোলনগুলো গড়ে উঠেছে, উত্তর বাংলার তরুণ লেখকরা সেই আন্দোলনে

যোগ দিয়েছেন। এভাবেই আধুনিক কবিতা, ছোটো গল্প : নতুন রীতি, ক্ষুধিত বংশ, ছাঁচ ভেঙে ফেলো, নতুন নিয়ম ইত্যাদি নানা ভাবনা ভেসে উঠেছে বাঙালী ও বাংলা ভাষার জীবনে। আমাদের উত্তরের নিস্তরঙ্গ জীবনের স্থির হ্রদে কদাচিৎ সেই মেঘ ছায়া ফেলেছে। এখন উত্তর বাংলাতেও নতুন জীবনের ধর্ম ও আধুনিকতার এক নব জাগরণ দেখা দিয়েছে। আত্মসচেতন মনোভাবই আধুনিকতার জন্ম দেয়। এই আত্মসচেতনতা উত্তর বাংলার কবি ও লেখকদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে, ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। উনিশ শতকের তথাকথিত রেনেসাঁসের বিক্ষুব্ধ ও জটিল সময়কালের সঙ্গে এই সময়ের কিছু মিল আছে। তাই বাংলা সাহিত্যে এ এক সন্ধিক্ষণ।

———

ভাদু মক্কেলের বউ

কণাবসু মিশ্র

ভাদু মক্কেল হাটে যাবার জন্যে তৈরি। বিলের ধারে নৌকা বাঁধা। সান্‌কিতে ভাত বেড়ে রজনী বলে,—চারটে ট্যাকা দাও।

ভাদুর গালে দু'দিনের না কামানো বাসী খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পাখীর বাসার মত তেলহীন রুখু চুল। হুঁকোটা বেড়ার গায়ে ঠেস্ দিয়ে এগিয়ে আসে ভাদু। সান্‌কির ভাতে হাত রেখে বলে,—হাটে না গেলি ট্যাকা দেব কনতে? ট্যাকা দিয়ে কি করবি শুনি? নথ গড়াবি? নাকি বাপের বাড়ি চালান মারবি?

ভাদুর বাড়ির পেছনে বহুদিনের পুরণো বাঁশঝাড়। সেখানে ঠকাস্ ঠকাস্ বাঁশকাটার শব্দ। সর সর করে বাঁশ নামার মত আওয়াজ হয়।—ওই শোনো গো। আওয়াজ হতিছে। ভাদুর বউ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। ভয়ে প্রায় সেঁধিয়ে যায় ভাদু মক্কেলের বুকের মধ্যে। কাটা কবুতরের মত ছটফট করে বউ। এ সময় ভাদুর ভাল লাগে না বউয়ের আদিখ্যেতা। ভাদু বলে, নে-নে, আর অগড় করিসনে। গাঁয়ের বউ ভয়-ডর মানায় না।

ওই শোনো গো, ফের শব্দ। ওই বুধো শার মা বাঁশ ঝাড়ে! ভাদু বউকে একটা ঠ্যালা মেরে বলে, তোর মাতা।

কাক ডাকলেও আলো ফোটেনি। চাঁদের ছিটে ফোটাও চিহ্ন নেই আকাশে। দাওয়ার ওপরে একটা কুপি জ্বলছে। কুপির হলুদ শিখায় আঙুল বুলিয়ে ভাদু মক্কেলের বউ নিজের বুকে রাম নাম লেখে। তখন হাপুস-হুপুস শব্দ করে ভাদু রাতের জল দেওয়া ভাত খায়। ভাদুর গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে। দু হাটু মুড়ে উবু হয়ে বসে ভাদু খেতে খেতে বলে, পান্তভাতে নেবুর পাতা দে মাখলি পরে খাসা। অ বউ যা তো, দুটো নেবুর পাতা ছিঁড়ে আন গাছ থিকে।

যাই আর কি? বাঁশঝাড়ে বুধো শার মা!

ভাদু এবারে আর রাগ করে না। হা হা করে চড়া গলায় হাসে। বলে, সোয়ামীর সিবা করতি যয়।

আমার মাতা খাও গো। আমি যাব নি। পাকা কলা আচে। খাও পান্ত ভাতে।

ভাদু কাঁধের গামছা দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছে বলে, তার চেয়ে চাট্টি মরিচ আন।

অমা। সেও তো গাচে।

ভাদু মক্কেল আর কথা বাড়ায় না। চেটে চেটে খুঁটে খায় ভাতের শেষ দানাটা পর্যন্ত।

রোজ তো হাট থাকে না। আজ হাটবার। বউ প্রায়ই বায়না করে একটা ময়না এনে দিতে। আজও ভাদু যখন বস্তায় মাল ভরে, আহ্লাদী বউ গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। বলে, একটা ময়না এনো গো। পাকানো বাঁশের লাঠিটা শূন্যের ওপর বার দুয়েক ঘুরিয়ে ভাদু বলে, আইন বো। আইন বো।

গামছা দিয়ে মাথায় বেশ একখানা পাগড়ী বেঁধে ভাদু বউয়ের থুতনী নেড়ে আদর করে বলে, আর কিসির ফরমাশ ?

বউ ফিক করে হাসে। তার সারা মুখে যৌবনের বান ডাকে। বলে, আর একখানা নাল ফিতে। চুল বাইধবো।

এই চুলির টিকিতে নাল ফিতে ?

কৃত্রিম রেজার মুখে তাকায় ভাদু মক্কেলের বউ। বলে, থাক্, আনতি হোবে না।

ভাদুর বুকের মধ্যে টাটায়। বলে, আইন বো। আইন বো।

স্বগ্‌গে যাবার আগে, মা বলে গিইচেল, বউর কোতা সব শুনাবিনি ভাদু। —মৃত মায়ের উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকায় ভাদু।

ভাদুর পরণে হাঁটু পর্যন্ত তোলা কাছামারা ধুতি। গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, এ গাঁয়ের মানুষের গায়ে এখন টেরিকটনের সার্ট উঠেছে। ভাদু সে সব গ্রাহ্য করে না। বিঘে দু'য়েক জমির মালিক ভাদু। মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থা। হিসেব করে পয়সা খরচ করে। ভাদু জানে, মা লক্ষ্মী, এই দেন তো এই কেইড়ে লন।

বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথে বেশ কাদা। ধুতিটা আর একটু তুলে ভাদু, দুগ্‌গা বলে হাঁটা দেয়। টিপ টিপ করে বেশ দু এক ফোঁটা মাথায় ঝরছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা খুব ভাল লাগে না ভাদুর। আজ বেশ ঢালবে মনে হয়।

বাঁশের খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা নৌকোর কাছি খুলে দিয়ে নৌকোটা সামান্য উজানে ঠেলেই ব্যাঙের মত লাফিয়ে পড়ে ভাদু। তারপর গলুইয়ের ওপর বসে জলে দু পা ডুবিয়ে কাদা ধুয়ে ফেলে। পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে লগির অনেকখানি ঢুকিয়ে দেয় জলের মধ্যে। জলের তলায় কাদায় লগি ডুবিয়ে ভাদু জোরসে মারে এক ঠ্যালা। নৌকো তর তর করে ভেসে যায়।

বুধো শার ভিটের পাশ দিয়ে যেতেই ভাদুর ইন্দ্রিয় ফের সজাগ হয়ে ওঠে। ওই আওয়াজ, সর সর সরাৎ। ঠক্ ঠক্ ঠক্। ভাদু হাসে। বিড় বিড় করে বলে, শাল্‌লা, ওই শব্দ শুনে বউ না জানি কি করতিছে। জোরে বাতাস বইলে বাঁশের গিঁটে ওই রকম আওয়াজ হয়। আর ঠক্ ঠক্ শব্দ তো কাঠঠুকরার। ভাদু আপনমনেই বকে। বিল বাঁয়ে ফেলে সরু খালের মত গলিটার পথ ধরে ভাদু। অন্য সময় এ গলিতে জল থাকে না। শুক্‌নো খটখটে। তখন মানুষের পায়ে চলার মত সরু একটা পথ তৈরী হয়। বর্ষার ছোঁওয়া পেয়ে ভরা খালের মত কাণায় কানায় ভরে যায় গলি।

সোনা ব্যাঙ হেঁকেই চলে। ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। ভাদুর কানে তালা লাগিয়ে দেয়। চারদিক ফর্সা হয়ে আসছে। ছাতা মাথায় বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে কে হাত নাড়ে ?

নাও বায় কে ? ও মাঝি, হাটের পানে যাও নাকি ?—জোরে চেঁচায় সতীশ জোয়াদ্দার।

ভাদুর মেজাজ খিঁচড়ে ওঠে। শাল্‌লা, আমি মাঝি ? মোর না, তুমি জানো না ? ভাদু কোন জবাব দেয় না। ও পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে লগি ঠেলে। জোয়াদ্দারকে ফেলে ভাদুর নৌকো সামনে এগোয়। সতীশের গলায় এবার অনুনয়, ও ভাদু মোকে নে যা বাপ। ভাদু বিড় বিড় করে, পথে এসো চাঁদ।

উঁচু ঢিবির পথ ধরে সতীশ জোয়াদ্দার এবার ছুটছে।—অ ভাদু ! মোকে নে যা।

বুড়ো মানুষ তো। মায়া হয় ভাদুর। মাটিতে লগি ঠেকিয়ে ও নৌকো আটকায়। মনে মনে বলে, তুমি সতীশ জোয়াদ্দার আজ বেশ কিছু জমির মালিক হয়ে জোদ্দার হইচ, তাই তোমার এতো গুমর। কার সবনাশ করে

জোদ্দার হইচ জানি নে ?

কাদা পায়ে উঠোনি গো বাবু। জলে পা জোড়া ধুয়ে লও। চেঁচিয়ে ভাদু বলে। সতীশ জোয়াদ্দার বলে, কাদা কোথা ? জুতো পরা রইচে না ? ভাদু হাসে, ওই শ্রীচরণের সু জোড়াই ধুতি কইচি।

রবারের পামসু জোড়া জলে ধুতে ধুতে কুটিল চোখে তাকায় সতীশ জোয়াদ্দার।

খাল, বিলের জলে এখন পানকৌড়ি, বকের সারি। এই ভোরবেলা নৌকো করে বেড়ানোর বড় সখ রজনীর। দুনিয়ার কাজ এই ভোরবেলা, তা ভাদু বউ নিয়ে বেড়াবে কখন ? রজনীরই কি এখন ফুরসৎ আছে নাকি ? সে উঠোনে গোবর ছড়া দেবে। হাস, মুরগীর পাল জলে ছাড়বে। ঘর, দাওয়া নিকোবে। ধান ভানতে যাবে তাছাড়া বউ নিয়ে ভাদু যদি বেরও হয়, এই সাত সকালে, গাঁয়ে না ঢি ঢি পড়ে যাবে ! ভাদুর মা চোখ বুঁজতে বুঁজতেই ভাদুর দ্বিতীয় পক্ষ মাথায় উঠেছে।

সতীশ জোয়াদ্দার পান চিবোতে চিবোতে কাঁধের ঝোলা থেকে একটা টানজিসটার বের করে।

বলে, দেখি, খপর হয় কিনা, শুনি ?

এদিক ওদিক কল ঘুরোয় বুড়ো। ভাদু মনে মনে হাসে। ভাবে, বাঙালের হাইকোর্ট দেখাও, তুমি ? এই ভোর পাঁচটায় আকাশবাণীর খপর ? রেডিও তো এখন ঘরে ঘরে।

অন্য কি এক সেণ্টারে অচেনা কোন ভাষায় গান হয়। সতীশ ভলিউম বাড়িয়ে খানিক শোনে। তারপর বিরক্ত হয়। বুড়োর কাণ্ড দেখে বিড়ি টেনে হাসি চাপে ভাদু। জোয়াদ্দার বলে, আমন ধান ইবার কেমন হল ভাদু ? ভাদু বলে, কই আর তেমন ?

খালের ওপরে মানুষে চলা বাঁশের একটা সাঁকো। সাঁকোর ওপর কে যেন দেইড়ে রইচে না ? ভাদু ভাবে, একি তার চোখের ভুল ? না। এ গলা কাটা গৌরের বউ। ই সময় ও হেথা কেনে ? ভাবগতিক সুবিধের নয়।

ভাদুর কান দুটো খাড়া হয়ে ওঠে। ইঁদুর ধরার আগে বেড়ালের যেমন অবস্থা। দু কানের লতি গরম। ভাদু কানে গোঁজা বিড়িটা টেনে ঠোঁটে গোঁজে। ফস করে দেশলাইয়ের একটা কাঠি ধরায়।

জোয়াদ্দারের নজরে পড়ে গৌরের বউ। সে বলে, ও ভাদু গতিক তো

সুবিধের লয়। কিসির যেন গন্ধ পাতিছি। ভাদু বলে, সে আপনিও পাতিছেন, আমিও পাতিছি। বলে আর কি হোবে ?

ভাদু জানে, সতীশের চোখে যখন পড়ল, সারা গাঁয়ে রাষ্ট্র হতে আর সময় লাগবে না।

গলা কাটা গৌরের বিধবা বউ ভাদুর দিকে বেহায়ার মত চেয়ে থাকে। বুকের মধ্যে গুড় গুড় করে ভাদুর। ভাদু হাটে যাবে সেকি এইজন্যে দাঁড়িয়ে আছে সাত সকালে ? হাসে। ভাদু মক্কেল ফতুয়ার পকেটে পুরতি পারে, তা জানো ? তবে হ্যাঁ, গায়ে পড়ে মেয়েছেলের সঙ্গে কোথা বলার সখ ভাদুর নেই।

সাঁকোর তলা দিয়ে যাবার সময় মাথা নীচু করে ভাদু। গৌরের বউ চাপা গলায় কি যেন বলে। ভাদু ভাবে, সাহস তো কম নয়। বউটা কি এখন লাইনের মেয়েছেলে হয়ে গেল ?

গৌরের জন্যে নিদুর এখন পরাণ পোড়ে।

সতীশ বলে, হায়রে গৌরে, ডাকাত মাইরতে গিয়ে তোর গলাই কাটা পইরল ?

ভাদু বলে, কি যা তা বলতিছ, গৌরের গলা কুথা কাটা পইরল ? ডাকাতের দাওয়ি কি ধারছিল ? গৌরের গলায় ভুঁতা দাওর কোপ পইরেছিল।

জোয়াদ্দার বলে, ওই হল আর কি ? সদর হাসপাতালে নে গে সিলাই মারা হল। তোর মনে রইবে ভাদু।

রইবে গো রইবে। সেই থিকেই তো ওর নাম দেলে সব গলা কাটা গৌরে।

জোয়াদ্দার বলে, হায়রে গৌরে, সে যাত্রায় বেঁইচে গেলিউ অকাল মরণ তোর কপালেই ছিল। কোনো রোগে ও মইরলো ভাদু ?

ভাদু বলে, মোশার কামুড়ি কি এই রোগ হয়।

কি রোগ ম্যালোরি ?

না গো ম্যালোরি নয়। সে নাম মোর মুখি আসে না। সে এক ইংরিজি নাম।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাদু বলে, গরীব মানিষ্যির জন্যি কি আর ডাক্তার বদ্যি আচে গাঁয়ে ?

সতীশ জোয়াদ্দার খুক খুক করে সামান্য কাশে। বলে, ঠিক। ভাদু

মনে মনে বলে, শালালা! তুমি তো ছিলে ট্যাকার গাছ। আইনতে পারলে নি শহরির বাদ্যি।

ভাদুর বুকের মধ্যে জ্বল জ্বল করে গৌরের বউয়ের ডাগর চোখ দুটো। সেও যদি গৌরের মত অকালে মারা যায়? তার বউও কি সাঁকোয় দাঁড়িয়ে লাইন মারবে?

গলি পেরিয়ে নৌকো খালে পড়ে। জলে নদীর মত স্রোত, ঠাণ্ডা। বৈঠা যেন কে টেনে নিতে যায়। জলের মধ্যে কলমী শাক। কলমী আর শাপলার গন্ধ নাকে আসে ভাদুর। বউ দেখলি পরে, ঠিক বইলতো। কিছু তুলে আনো না গো। ভাজা কইরতুম।

এই খালই মিশে গেছে গঙ্গায়। ভরা বর্ষার খাল এখন টইটুম্বুর। বৈঠা না বেয়ে স্রোতের টানে খানিক ভেসে যায় ভাদু।

এ সময় রজনী থাকলে বেশ হত।

এই তো সেদিন নৌকোর ছইয়ের তলায় ঘোমটা টেনে বসেছিল নতুন বউ। সূর্যিটা লাট খাচ্ছিল মাথার ওপরে। নৌকোর পাটাতন আলো করে বসেছিল, ভাদু মক্কেলের দ্বিতীয় পক্ষ। সেই কনে দেখা আলোয় বউয়ের চোখে পিদিম জ্বলা দেখেছিল ভাদু। না না, রজনী মেয়ে ভাল।

কিন্তু গৌরের বউ? ভাদুর বুকের মধ্যে বাজপাখীর মত চেয়ে থাকে এক চোখ। গৌরের বউ অমন করে চাইলে কেন? ভাদু কি সবনাশের নিশায় পইরবে? তা হতি পাইরবে নি।

মনোযোগ দিয়ে ভাদু ভাবে, রজনী যেন কি চেয়েছিল? একটা ময়না পাখী। সেই পাখীকে আদর করে দানা খাওয়াবে রজনী, বুলি শেখাবে। ভাদুর ছেলেমানুষ হাটুর বয়সী দ্বিতীয় পক্ষ। ভাদু হাট থেকে তাকে ময়না পাখী এনে দেবে।

গৌরের বউ কি চায় তার কাছে? কি শনি, মঙ্গলেই কি সে দাঁড়িয়ে থাকবে, হাটের পথে ভাদু যখন যাবে? কথাটা ভাবতেই ভাদুর মাথার মধ্যে বন্ বন্ করে লাট্টু ঘোরে। সেই লাট্টুটাকে থামাতে চায় ভাদু। পারে না। ভাদু মক্কেলের বৈঠা অনবরত নেচে যায়। জলে ঘূর্ণির মধ্যে পাক খায় লাসাময়ী যুবতী। তার বুকের মধ্যে ময়না পাখীর বাসা। আর সেই বাসার ওপর বুক জ্বালা নিয়ে ছোবল মারে একটা কালনাগিনী। তাদের খেলায় হা হা করে হাসে ভাদু মক্কেল।

———

দেনমোহর

এ, মান্নাফ

শামীমা ফিরে এল।

অথচ শামীমার ফিরে আসার কথা আমরা কেউ ভাবতেও পারছি না। হঠাৎ শামীমাকে ফিরে আসতে দেখে আমরা স্তম্ভিত। আমি যেদিন শামীমাকে আমার সঙ্গে ফিরে আসার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিলাম, শামীমা কিন্তু সেদিন ফিরে আসেনি। উল্টে আমাকে বলেছিল—'আমাদের স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে, তোমাকে নাক. গলাতে বলেছে কে? এটা আমি পছন্দ করি না।'

পছন্দ না করাই ভাল, তাই বলে এত বড় অমানুষিক আচরণ সহ্য করি কি করে? শামীমার শুকনো চুল ওর মুখের উপর উড়ছিল। পরনে ছিল সস্তাদরের একটা তাঁতের শাড়ী। গায়ে অলঙ্কারের বালাই নাই। সম্পূর্ণ নিরাভরণ তার দীর্ঘ সাতাশ বৎসরের জীবনে আমি কখনও এত অল্প দামী শাড়ী পরতে দেখিনি। শামীমাকে দেখে এক চূড়ান্ত অঘটনের আশঙ্কায়—আমার মন কেঁপে উঠল। আমার স্ত্রী শামীমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই এক গ্লাস সরবত বাড়িয়ে দিল। ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে শামীমাকে সুস্থ করার চেষ্টা করল। এতক্ষণ ধরে শামীমা মুখ খোলেনি। শামীমার ওপর যে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে সেটা আমরা তাকে দেখেই স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। এটাও বুঝেছি সে টলেনি। শক্ত মন নিয়ে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে।

শামীমা—আমার বোন। ওর যখন সাত বৎসর বয়স—তখনি মা-বাবাকে হারিয়েছিলাম আমরা। আমার স্ত্রী শামীমাকে বোনের মতই মানুষ করেছে।

শামীমা ইংরাজীতে অনার্স সহ বি-এ পাশ করেছে। শামীমার চাকরি করার ইচ্ছা ছিল সে সুযোগও পেয়েছিল। আমাদের শুভানুধ্যায়ী আমজাদ

চাচা স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক। তিনি শামীমাকে তার স্কুলে—কাজ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার মত ছিল না। আমি শামীমার বিয়ের কথা ভাবছিলাম। এ ব্যাপারে ভিতরে ভিতরে কিছুটা এগিয়েও গিয়েছিলাম। ভাল পাত্র। সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর। নাম লতিফ। সুপুরুষ। বাড়ীর অবস্থাও ভাল। ওর সংসারে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। আমার সব কথা শুনে শামীমা বলেছিল—'এই জন্যে আমাকে চাকরি করতে দিতে রাজী নও জামাল ভাই।'

—তোমার চাকরি করার বিরোধী আমি নই বোন। তবে কি জানিস—যে কাজটা যে সময়ের সেই কাজটা ঠিক সেই সময়েই করা ভাল। বিয়ের পর তোর বর মশায় যদি চাকরি করার অনুমতি দেন, তাহলে তুই চাকরি করবি!

—বুঝেছি জামাল ভাই, তুমি এবার আমাকে ঘাড় থেকে নামাতে চাও এই তো। বেশ, তুমি যা ভাল বোঝ কর।

আমার ইচ্ছানুসারে শামীমার বিয়ে হয়েছিল।

শামীমার চরিত্র বড় অদ্ভুত। প্রতিটি কাজে ওর গভীর আন্তরিকতা। কাজের মধ্যে ডুবে যাওয়াই ওর স্বভাব। কাজ আরম্ভ করে—পিছিয়ে আসার পাত্রী সে নয়। পড়াশুনা, সেলাই শিক্ষার সময়—ঐ একই স্বভাব আচরণ আমি লক্ষ্য করেছি। এছাড়াও তার চরিত্রে আরও একটা বড় গুণ ছিল সে স্বার্থপর নয়।

পারিবারিক শান্তি রক্ষার জন্যে প্রয়োজনবোধে সে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতেও দ্বিধা করে না। মোটকথা বর্তমান যুগের আর দশটা মেয়ের মত সে মোটেই ছিল না।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, শামীমা বিয়ে করেও সুখী হল না। শামীমার অশান্তির কথা কোনদিন তার মুখ হতে শুনিনি। লোক মুখে শুনেছি লতিফ মাতাল। প্রত্যহ মদ খেয়ে গভীর রাতে বাড়ী ফেরে। শামীমার গায়ে হাত তুলতেও সে নাকি দ্বিধা করে না।

সীমাহীন ধৈর্য শামীমার। নীরবে সে সব কষ্ট সহ্য করেছে। শুনেছি—সে নানা কৌশলে লতিফকে মানুষ করার চেষ্টা করেছে। শামীমার সে চেষ্টা কি নিষ্ঠুরভাবে ব্যর্থ হয়েছে, সে দৃশ্য আমার চোখে দেখার সুযোগও হয়েছিল। ঘটনা চক্রে একটা রাত, আমাকে শামীমার বাড়িতে কাটাতে হয়েছিল। রাত্রি

দশটা, লতিফের পাত্তা নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, "লতিফ কোথায় রে?"

ছোট জবাব—"অফিসের কাজে শহরে গেছে।" শামীমাকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

আমাকে খেতে দিল শামীমা। আমি বাধা দিলাম।—"এখন থাক না। লতিফ সাহেব আসুন। অনেকদিন দেখা হয়নি। একসঙ্গে খাওয়া যাবে।"

শামীমা আমার প্রতিবাদ গ্রাহ্য করল না। শুধু বলল—"সে কখন ফিরবে, তার ঠিক নেই। তুমি শুধু শুধু রাত্রি জেগে বসে থাকবে কেন?"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"লতিফ কি প্রায়ই রাত্রি করে বাড়ী ফেরে?"

শমীমা নীরব?

—"তাহলে, তুই এই নিরালা ঘরে একা থাকিস কি করে?"

মরা হাসি হেসে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইল শামীমা—"না না, তা হবে কেন, আজ অফিসের কাজে দূরে গেছে কিনা, তাই দেরী হচ্ছে।"

—"তা হবে হয়তো।" ওর ভাবভঙ্গী দেখে আর কথা না বাড়িয়ে আমি আহার সমাপ্ত করলাম। শরীরে ক্লান্তি ছিল, শুতেই ঘুম এসে গেল। হঠাৎ শামীমার চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ছুটে ঘর হতে বেরিয়ে এসে যে দৃশ্য দেখলাম, হতবাক না হয়ে পারলাম না। লতিফ শামীমাকে মাটিতে ফেলে লাথির পর লাথি মারছে।

নিজেকে স্থির রাখা সম্ভব হল না। রক্ত মাংসের শরীরের সহ্য শক্তির একটা সীমা আছে। টান মেরে লতিফকে সরিয়ে এনে ধমকে উঠলাম—"ছিঃ ছিঃ একি করছ লতিফ।"

লতিফ তখন নেশায় চুর। মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বের হচ্ছে। গলায় জড়িত স্বর। অস্থির দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকিয়ে জড়িত স্বরে বলল—"তুমি শামীমার কোন ভাতার এলে হে?"

মার খাওয়ার পরও নিজেকে সামাল দেবার জন্যে শামীমা ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠল—"তুমি আমার জামাল ভাইকে চিনতে পারছ না?"

"চোপ মাগী—নাগরকে আর ভাই বলে চালাতে হবে না। মদ খেয়েছি বলে কি চোখের মাথা খেয়েছি"—কথাটা বলেই আর এক লাথি বসিয়ে দিল শামীমার পেটে। মাগো—বলে শামীমা আর্তনাদ করে উঠল। আছড়ে পড়ল দূরে।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে লতিফের গালে প্রচণ্ড

জোরে চড় বসিয়ে ধমকে উঠলাম—"মুখ সামলিয়ে কথা বলবি জানোয়ার।"

বন্ধ মাতাল লতিফ। আমার চড়টা সামলাতে পারল না। ডিগবাজী খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

শামীমা তাড়াতাড়ি ধমকে উঠল আমাকে—"তুমি একি করলে জামাল ভাই।"

—"ঠিকই করেছি। জানোয়ারের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিত, তেমনিই করেছি।"

ইতিমধ্যে শামীমা লতিফের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে আমাকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছিল—"আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে তোমাকে নাক গলাতে বলেছে কে? এটা আমি পছন্দ করি না।"

এবার আমার চমকে ওঠার পালা। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। তবু আমি শামীমাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলাম—"তুই আমার সঙ্গে ফিরে চল। এই জানোয়ারের সঙ্গে সংসার করা একেবারে অসম্ভব।"

—"এই জানোয়ারের সঙ্গে বিয়েটা তো তুমি দিয়েছিলে জামাল ভাই।"

—"আমি ভুল করেছিলাম শামীমা।"

—"সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত এখন আমাকে করতে দাও।"

—"প্রায়শ্চিত্ত কি কম হল? এবার বাড়ী ফিরে চল। এমন মানুষের সঙ্গে তোর কখনও মিল হতে পারে না। তাছাড়া আমার চোখের সামনে যে ঘটনা ঘটল। আমি তো বাড়ী ফিরে শান্তিও পাবো না। চল্ আমার সঙ্গে।"

—"তা হয় না জামাল ভাই। এই অবস্থায় আমার স্বামীকে ফেলে তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারি না। তুমি বরং এ বাড়ী থেকে চলে যাও।"

আমি ভোরেই বাড়ী ফিরে এসেছিলাম। অভিমান কিছুটা হয়েছিল। তবু শামীমার কথা ভেবেছি। ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়েছি। সঠিক পথের সন্ধান পাইনি। সেদিনের সে লজ্জাজনক ঘটনার পর—শামীমাও আর আমাদের কোন চিঠিপত্র দেয়নি। আমার স্ত্রী চিঠি দিলেও উত্তর আসতো না। সেই শামীমা কয়েক মাস পরেই ফিরে এল।

কিন্তু কেন?—আমাদের কৌতূহলের সীমা নাই।

কিছুক্ষণ পর আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল—"শামীমা বলতো তোর কি হয়েছে।"

মৃদু উত্তেজনাময় কণ্ঠে বলল—"ও আমাকে তালাক দিয়েছে।

আমার স্ত্রী যেন আকাশ থেকে পড়ল।—"সে কিরে? তোকে তালাক দিয়েছে?"

—"হ্যাঁ।"

—"কেন?"

—"রাতে মদ খেয়ে ফিরে এসে ঝগড়া করছিল, আমাকে মারছিল। সহ্য করতে না পেরে আমি রুখে দাঁড়িয়েছিলাম, তখনি ও বলল—তোমাকে তালাক, তালাক, তালাক, বেরিয়ে যাও, আমার বাড়ী হতে।"

এরকম একটা বিচ্ছেদই আমি কামনা করছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—"সেই তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল?"

—"ছিল। সন্ধ্যারাত তো, ঝিটা তখনও বাড়ী ফিরে যায়নি।"

—"তারপর?"

—"তারপর আবার কি? আমাকে তালাক দিয়েছে যখন, তখন তো আর আমার ওর বাড়ীতে থাকার অধিকার নাই। সকালে উঠেই চলে এলাম।"

—"আমি তো ১৫ ভরি সোনার অলঙ্কার, অনেক দামী দামী কাপড় চোপড় দিয়েছিলাম সেগুলো নিয়ে এলি না কেন?"

—"কিছুই খুঁজে পাইনি। সব সরিয়ে ফেলেছে। না হয় মদে উড়িয়েছে।"

—"তুই যখন ঘর হতে বের হলি, লতিফ তখন কি করছিল?"

—"ঘুমোচ্ছিল?"

—"তুই লতিফকে জাগিয়ে বলে এলি না কেন—আমি চলে যাচ্ছি।"

—"তা বলতে যাবো কেন? ও তে আর আমার স্বামী নয়।"

কি আশ্চর্য! এতদিনের একটা সম্পর্ক মাত্র তিনটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল? লতিফের ঘরের চিত্রটা আমার মানস চোখে ভেসে উঠল। কি আগোছাল ছিল ওর সংসার। ঘটক হাবিব সাহেব আমাকে বলেছিলেন—ঘরে মানুষ না থাকলে যা হয়, এত বড় বাড়ীটার কি অবস্থা করে রেখেছে দেখছেন! ঘর হতে বাগান পর্যন্ত কয়েক ট্রাক ময়লা ভর্তি। শামীমা বৌ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর রূপ পরিবর্তন হল। ছ্যাতলা পড়া বাড়ীটার ছাল-ছামড়া পালটানো হল। নতুন রংয়ের পালিশ উঠল তার শরীরে। দরজা জানলায় রং-বেরং-এর পর্দা ঝুলতে লাগল।

আর মরা বাগানটা শামীমার হাতের গুণে সজীব হয়ে উঠল। নতুন ফুলের চারা এল। মালীর পাশে দাঁড়িয়ে সেইসব চারা বসানো হল। বীজ বোনা হল। ফুট ফুটল। কিন্তু শামীমা অক্লান্ত পরিশ্রমেও লতিফের মনের আবর্জনা সাফ করতে পারল না। তার মনের উর্বর ভূমি খুঁজে পেল না। স্নিগ্ধ ভালবাসার বীজ বুনতেও পারল না। সেক্ষেত্রে প্রেমের ফুল ফুটলই না। মাত্র তিনটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শামীমার সাজানো সংসার ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল। এ স্বামী তার স্বামী নয় আর। ঐ ঘর-বাড়ী, বাগানে তার আর স্থান নেই। ঐ ঘরের জিনিসপত্রের ওপর তার কোন অধিকার নেই। আদালতে আশ্রয় নেবারও তার কোন পথ নেই। একমাত্র দেনমোহরের টাকা ছাড়া—স্বামীর কোন বিষয়ের উপর তার কোন স্বত্ত্ব নেই। আর সেই দেনমোহরের টাকা আদায় করাও সহজ নয়। তার জন্যে আদালতের আশ্রয় নিতেই হবে।

কিন্তু যারা গরীব। যাদের আদালতের পথ চেনা নেই! সে পথে পা ফেলার সামর্থ্য নেই; তাদের কি হবে?

তাছাড়া যে-সব স্বামী শাসটুকু খেয়ে ছিবড়েটুকু ছুঁড়ে ফেলে দেবার মতই তালাক অস্ত্রটা ব্যবহার করে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করে—সে-সব মেয়েদের কি হবে? মুসলমান সমাজের মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা নেই বললেই চলে। তারা স্বাবলম্বী হতেও পারবে না। যাদের বাড়ীর অবস্থা খারাপ —যারা সম্পূর্ণরূপেই স্বামী নির্ভরশীল এ-সব ক্ষেত্রে ঐসব হতভাগিনীদের কি হবে?

আমি আর ভাবতে পারছি না। সমস্যা আর সমস্যা। সমস্যা নিয়ে যতই ভাবা যায়, ততই নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়।

লতিফ একস্থানে দাঁড়িয়ে—তিনবার—'তালাক, তালাক, তালাক'—শব্দ উচ্চারণ করেছে—এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হবে কিনা, বিবাহ-বিচ্ছেদটা আইনসম্মত হয়েছে কি না; সমাজ শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারীদের (মৌলভী সাহেবদের) মধ্যেও তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

শামীমা ফিরে আসার পর কয়েকটা দিন কেটে গেল।

শামীমার মনের দুঃখ লঘু করার জন্যে আমার স্ত্রী সর্বদা শামীমাকে সঙ্গদান করে, সিনেমা যায়। প্রত্যহ বেড়াতে বের হয়। তবু নিরালা মুহূর্তে শামীমাকে চিন্তা ভাবনাই করতে দেখি। আমি অনুতাপের আগুনে জ্বলে

মরি। নিজেকে অপরাধী সাজিয়ে আমি যন্ত্রণা ভোগ করি। শামীমার জীবনের এই দুর্যোগের জন্যে আমিই তো দায়ী!

শামীমা একদিন বলল—"জামাল ভাই, মাদ্রাসার হেড মৌলভীর কাছে আমার ডিভোর্সটা ঠিক শাস্ত্রসম্মত হয়েছে কিনা—জেনে এস না।"

শামীমার কথামত মৌলভী সাহেবের কাছে এসেছিলাম। তিনি সবকিছু শুনে বললেন—"আপনার বোনের তালাক হয়নি।"

—জিজ্ঞাসা করলাম—'কেন?'

—তিনি ব্যাখ্যা দিলেন—তিন স্থানে বিভিন্ন সময়ে তিনবার, তালাক তালাক, তালাক বললে—তালাক হয়। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে একস্থানে দাঁড়িয়ে পর পর তিনবার তালাক শব্দ উচ্চারণে তালাক হয় না।

মৌলভী সাহেবের ব্যাখ্যা শামীমাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। তার চোখ মুখ কঠিন হয়ে উঠল। সে শক্ত কণ্ঠে বলল—"জামাল ভাই, তুমি বরং আর একজন মৌলভী সাহেবের কাছে যাও।"

আমার বিশেষ পরিচিত আবেদিন মৌলভী সাহেবের কাছে শামীমার ঘটনা বর্ণনা করে উপদেশ প্রার্থনা করলাম।

আবেদিন সাহেব খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"শামীমা খুব কান্নাকাটি করছে নাকি?"

—"না।"

আবার প্রশ্ন করলেন—"লতিফ সাহেব শামীমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলেন নাকি?"

এবার আমি অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"আবেদিন সাহেব, আপনি এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

আপনি ব্যাপারটি বুঝতে পারছেন না জামাল সাহেব—"তালাক শব্দটির অর্থ হল বিচ্ছিন্ন হওয়া। ওঁরা যদি মনের দিক হতে সত্যিই বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকেন, নিজের কৃতকর্মের জন্যে যদি অনুতপ্ত হন, তাহলে তালাক তালাক তালাক বললেও ওঁরা বিচ্ছিন্ন হবেন না। তোওবা করিয়ে পাঁচজন ফকির খাইয়ে ওনাদের মধ্যে আবার মিলন করিয়ে দিব।"

আমার কাছে আবেদিন সাহেবের মতামত শুনে শামীমা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল—"উনি মিলন করিয়ে দেবেন কি করে? যে ঘটনা ঘটেছে—সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম আইন কি বলে—সেটাই হল

আসল কথা। উনি গায়ের জোরে আমাদের মিলন করিয়ে দেবেন নাকি ?"

জামাল ভাই—"তুমি একবার পাগল মৌলভী সাহেবের কাছে যাও তো ?"

পাগল মৌলভী সাহেব একজন গোঁড়া মুসলমান। তিনি ধর্মের ভণ্ডামী সহ্য করতে পারেন না। বড় ঠোঁট কাটা। স্পষ্ট কথা বলতে কোন দ্বিধা সংকোচ রাখেন না। সেই জন্যে লোকে তাকে পাগল মৌলভী বলে। তিনি ঘটনার আনুপূর্ব শ্রবণ করে বললেন—"জামাল সাহেব, আপনি মদ খেয়ে প্রচণ্ড রাগের বশে নিজের খড়ের ঘরে আগুন দিলে কি জ্বলবে না ? মদ খেয়ে আগুন দিয়েছেন বলেই কি আপনার খড়ের চাল পুড়বে না ?"

আমি বললাম—"একশবার পুড়বে।"

—"তাহলে এক্ষেত্রেই বা তালাকটা হবে না কেন ?"

প্রশ্নের মধ্যেই জবাবটা পেলাম। এমন সময় খবর পাওয়া গেল—লতিফ আবার বিয়ে করছে। সেখানে সে শামীমাকে তালাক দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

শামীমা বলল—"জামালভাই, আর তো নীরব থাকা উচিত নয়। একবার একজন উকিলের উপদেশ নেওয়া দরকার। এর একটা বিহিত ব্যবস্থাও করতে হবে।"

—কি করতে চাস শামীমা ?

—কেন ? দেন মোহরের মামলা কোরবো।

আমি বাধা দিলাম। "তুই ঐ জানোয়ারটার হাত হতে মুক্তি পেয়েছিস সেই যথেষ্ট, আর ঝামেলা পাকাতে হবে না।"

"এই জানোয়ারদের শিক্ষা দেবার জন্যেই মামলা করা দরকার জামাল ভাই। দ্বিতীয় পক্ষ স্ত্রীর সঙ্গেও তো সে এমনি অত্যাচার করবে। সেই মেয়েটাও পরে যাতে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে ; তার জন্যেও এটা করা দরকার।"

একদিন শামীমাকে সঙ্গে শহরের খ্যাতনামা উকিল নির্মলবাবুর চেম্বারে হাজির হলাম। নির্মলবাবু সব কিছু শুনে কয়েকটা ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

—"তালাক দেওয়ার সময় তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল কি ?"

শামীম উত্তর দিল—"ছিল। বাড়ীর ঝি।"

—"প্রয়োজনবোধে ঝিটা তোমার পক্ষে সাক্ষী দেবে তো ?"

—"নিশ্চয়ই দেবে। আমার বিশ্বাস আছে।"

—"আজ তিন মাস তুমি যে তোমার দাদার বাড়ীতে রয়েছ, ইতিমধ্যে তোমার স্বামী তোমাকে কোন রেজিস্টার্ড লেটার দিয়েছেন কি ?"

—"না। তাছাড়া উনি এখন দ্বিতীয় বিবাহ করছেন।"

"তাহলে তোমার ডিভোর্স হয়ে গেছে। তুমি এবার স্বচ্ছন্দে দেন মোহরের কেস করতে পারো।"

দেন মোহর আদায়ের কেস সুরু করে শামীমা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। তার ভাবীর সঙ্গে আবার আগের মত ছেলেমানুষী সুরু করল। বেশ হাসিখুশী। আমাকে বলল—"জামাল ভাই আমি কিন্তু এবার চাকরি করবো।"

শামীমার চাকরি করার ব্যাপারে আর বাধা দেওয়ার কোন কারণ ছিল না। আমজাদ চাচাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি হাসতে হাসতে বললেন—"চাকরি পাওয়া কি এতই সোজা মা। তুই তো একবার চাকরি না করে স্বামীর ঘর করতে গেলি।"

শামীমা হাসতে হাসতে জবাব দিল—"সে সাধ পূরণ করে এলাম চাচা।"

—"শুনেছি মা। জীবনের সুরুতেই এমন অঘটন সত্যিই মর্মান্তিক। যাক যা হয়ে গেছে, তার জন্যে দুঃখ করিস না।"

—"তাহলে আপনি আমাকে আপনার স্কুলে একটা কাজ দিচ্ছেন তো চাচা।"

—"এখন তো কোন পদ খালি নেই। তবে এ বছরে একজন বি, টি পড়তে যাচ্ছেন, ওনার বদলীতে এখন কাজ সুরু কর। পরে সুযোগ সুবিধে বুঝে তোকে নেবার ব্যবস্থা করবো। লেগে যা। কপাল তো ভালই দেখছি !"

যাক শামীমার চাকরি হল। চাকরি নিয়ে শামীমা ওর স্বভাব মতই মেতে উঠল। এদিকে দেন মোহরের মামলায় ১৫ হাজার টাকার ডিগ্রী পেয়ে গেল।

আমার স্ত্রী একদিন জিজ্ঞাসা করল—"শামীমা, আর কি বিয়ে করবি না ?"

শামীমা উত্তর দিল—"বিয়ে করবো না, এমন প্রতিজ্ঞা তো আমি করিনি ভাবী। পাশাপাশি চলার জন্যে মনের মত মানুষ পেলে সে চিন্তা নিশ্চয়ই করবো। তবে নিজের সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে স্বামীর ঘর করতে আমি কখনও যাবো না।"

সঠিক পথে চলতে পারার নামই শিক্ষা। সে শিক্ষা শামীমার আছে।

———

শেষ বাজনা

সন্তোষ মণ্ডল

একটা ডাক শুনবে নফর দাস। শুনতে শুনতে সেই ডাক তার চেতনাকে চমকে দিয়ে স্মৃতির ভিতরকার পলি সরাবে। সেখানে অনেক মৃত মানুষের ডাঁই করা মুখ, দাউ দাউ আগুনের শিখা আর কোমরে আটকে থাকা খোলটায় বোল তুলে শব গানে মেতে থাকা সে নিজে। ডাক শুনলেই সেই কাটামুণ্ডুর টাকার রুপোলী দিনগুলোর মত একটা দিন আবার তাকে ছুঁয়ে যাবে। আর তখনই বাতাসে ছোঁক ছোঁক নিঃশ্বাস টেনে পোড়া গন্ধটা পেয়ে যাবে নফর। গন্ধটা যে কি নেশা ধরায়! দেয়ালের পেরেক থেকে খোলটা পেড়ে নেয় নফর। দুই জানুর উপরে খোলটা রেখে ডাইনে বাঁয়ে চাঁটি লাগায়। বাজনাটা তেমন আর খোলে না। কেমন বেতালা ঠেকে নিজের কানেই। একনাগাড়ে কিছুক্ষণ বাজিয়ে শুকনো হাত দুটো অসাড় হয়ে থেমে থাকে। হাঁফ ধরে বুকে। পাকা ভ্রূর ঝোলা মাংস ঠেলে নফর চোখ খোলে। সে চোখ কেবল ধুম্রো দেখে। চিতার ধুমের মতন। ধুম্রো আর ধুম্রো। ধনুক বাঁকা শরীরটায় ঝিম ধরে। দাওয়ার খুঁটিতে পিঠ রেখে ঝিমোয়। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে নফর। তার নাম ধরে কে যেন ডাকছে। সেই ডাক তার কানের ভিতর দিয়ে বুকে এসে ভেঙে ভেঙে রক্তে মিশে যাচ্ছে যেন। ঠাণ্ডা রক্ত তেতে উঠল। ঝিমোনিটা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। ওঠার চেষ্টা করে নফর। পারে না। যেন কোমরের সঙ্গে একটা ভারী পাথর বাঁধা আছে। তার নাতি নিতাইকে ডাকে—'দ্যাখ দেখি নিতে। কুথা থেকে ডাক আইছে। বুধায় গাঙ্গই যেতে হবেক।'

নিতাই ওই সময় বিড়ি পাকায়। দাদুর ডাকে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখের চামড়ায় অসংখ্য আঁকিবুঁকি রেখাগুলো কি এক আকর্ষণে গুণতে থাকে। পাকা ভ্রূর মাংস ঢাকা চোখ। চোখের কোণায় পিচুটি। ঠোঁটের গলিতে জমে থাকা লালা। কানের লতিতে আগাছার মতন পাকা চুল। সব মিলিয়ে দাদুকে কেমন অস্বাভাবিক মনে হয় তার। আজকাল

গলার স্বরটাও কেমন ঠাণ্ডা মেরে বসে যাচ্ছে দাদুর। নিতাইয়ের এই সময় রাগ হয় দাদুর উপর। কাজের সময় এই এক উটকো ঝামেলা। মনে মনে বলে—'তোমাকে যে ইবার মাচায় উঠতে হবেক সে খিয়াল কি তুমার আছে হে বুড়ো।' তারপর গলাটাকে একটু মোলায়েম করে নিয়ে বলল—'দাদু পাগল হইছ নাকি। বুড়িয়ে বাহাত্তরে গেলে। তোমাকে আবার ডাকবে কে। উট তুমার মুনের ভুল। তুমি ভুল বকছ।'

হতাশ হল নফর। স্বগত উক্তির মতন সে বলল 'কি বলালি আমার মুনের ভুল। আমি বুড়ো হইছি। আমাকে কেউ ডাকবে না।'

'না। চুপ করে বসে থাক। আর এ্যা লাও একট বিড়ি খাও।'

নিতাই একটা বিড়ি ধরিয়ে বুড়োর কাঠি কাঠি আঙুলের ফাঁকে গুঁজে দেয়। নফর বিড়ি টানতে থাকে। টানার সময় গাল দুটো ছেলেদের গুলি খেলার গর্তের মতন দেখায়। বিড়ি মুড়তে মুড়তে নিতাই বলল—'দাদু, নকে মরে গেলে তুমি খুল বাজিয়ে মড়া খিদার। তুমি মরে গেলে কে খুল বাজাবে?'

কথাগুলো ঢিল ছোঁড়ার মত নফরকে আঘাত করল। মাথার ভিতরের স্নায়ুগুলো গরম হয়ে উঠছে। বুকের ভিতরে রাগের বাষ্প ঘুরপাক খাচ্ছে। নফর গলার স্বরটাকে উঁচুতে তুলে বলল—'কি বলালি শালা আটকুড়োর ব্যাটা। আমি মরে যাব। তুর বাপকে খেঁয়েছি। তুর মাকে খেঁয়েছি। ইবার তুখে···'

কথাটা আর উচ্চারণ করতে পারে না নফর। বুকটা একবার মোচড় দিয়ে থেমে যায়। চোখে জল আসে। সেই জল গলার ভিতর দিয়ে বুকে নেমে আসে। গলা আটকে যায়। তারপর রুদ্ধ গলায় নফর বলল—'তু আমার বিলাতে বাজাবি না নিতে।'

কান্নাভেজা কথাগুলো ঠোঁটের দেয়ালে জড়িয়ে যায় নফরের।

নিতাই তার দাদুর মুখের চড়াই উৎরাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুকটা তার মমতায় ভিজে উঠল। নিতাইয়ের খেয়াল হয় এই সময় দাদুর খাওয়ার অভ্যাস। ক্ষিধে লাগলে দাদু মুখ ফুটে কিছু বলে না। কতদিন এমন হয়েছে সে ঘরে না থাকলে দাদুর খাওয়াই হয়ে উঠেনি। নিতাই বিড়ি বাঁধা রেখে উঠে দাঁড়াল। হেঁসেল থেকে ভাত নিয়ে সানকির থালে রাখল। ভাতগুলোকে ছেনে গলিয়ে নিয়ে তরকারী মাখাল। থালাটা এগিয়ে দিল দাদুর কাছে—'ভাত দিনছি দাদু খেঁয়ে লাও।'

ঐ ভাত গলায় নামতে চায় না নফরের। মড়া পুড়িয়ে বাড়ি ফেরার আগে আর শ্রাদ্ধকর্মে যে লুচি মিষ্টির ফলার সে নিত্যদিন খেয়ে এসেছে তার স্বাদ যেন এখনও জিভে লেগে আছে। গলা ভাতে তার মন ওঠে না। সে কথা মনে হলেই জিভটা মুখের ভিতরে লকপক করে ওঠে। লালা গড়ায়। ঘরে তার ছেলে ছেলের বউ নাতি বিনা তরকারীর থসা ভাত চিবোয় আর নফর তখন লুচি মিষ্টির গামলায় ডুবে থাকে। ওর পরিবারের লোকদের কথা মনে হয় না যে তা নয় ওরা চোখের সামনে একবার ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়। পাতে পড়লে তখন আর কিছুই মনে থাকে না। বার বার নফর তার নাতি নিতাইকে বলেছে—'আমার সঙ্গে ঘুর নিতাই। আঘেরে কাজে দিবেক। রাজার হালে থাকবি।'

তা ও শালা আবার এই বিত্তি করবে না। বলে কি মড়ার সঙ্গে খোল বাজিয়ে নামগানকে সে ঘিণা করে। সেও বলে, যাহ্ শালা ত্যাবে ভাগাড়ে যেঁয়ে মরগা। ও নিয়ে আর কোন কথা বলে না নফর। সামনে সানকির থালে গলা ভাত পড়ে থাকে। শরীরে আবার ঝিম ধরে। চোখে তন্দ্রা নামে।

সন্ধ্যা তখন সারা শরীরে অন্ধকার মাখতে শুরু করে। লম্ফটা জেবলে দিল নিতাই। পেছনের দেয়ালে নফরের ক্ষীণ ছায়া। নিতাই সেই ছায়াটার কাছে দাদুকে ছেড়ে দিয়ে কারখানা চলে যায় বিড়ি গোণাতে। খুঁটিতে পিঠ রেখে নফর ঝিমোয়। আবার সেই ডাক। সজাগ হয়ে ওঠে নফর। কে যেন তার নাম ধরে ডাকল। বোজা চোখ দুটো খুলে দিল নফর। দৃষ্টি ধোঁয়াটে অন্ধকার। অলস তন্দ্রার ভাবটা ধীরে ধীরে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে নফর। কান দুটো খরগোসের মত খাড়া রাখে। বাতাসে ছোক ছোক নিঃশ্বাস টেনে সেই পোড়া গন্ধটা পেয়ে যায়। আবার সেই ডাক। পিঠটাকে টানটান করে নেয় নফর। না। এ ডাক মিথ্যা হতে পারে না। অনেকদিন আগের ডাকগুলোর সঙ্গে কোথাও যেন মিল খুঁজে পেল সে। ডাক মানেই টাকা, কাপড় আর উৎকৃষ্ট ফলার। সে কথা ভেবে রসস্থ হয়ে ওঠে তার জিভটা। মানে আরও কটা দিন রাজভোগ খেয়ে রাজার হালে থাকা। সুনিশ্চিত কটা দিন। বুকে একটু খুসীর বাতাস লাগে নফরের। এই সময় নিতাইকে খোঁজে নফর—'ওরে নিতে ডাক আইছে। বুধায় যেতে হবেক। আমার ছ' ছাড়াত আর কেউ ভবলদী পেরুবেক না।'

নিতাইয়ের কোন সাড়া পেল না নফর। সে জানে না নিতাই ঘরে নেই। শেষমেষ নফর উঠে দাঁড়াল। ভারী ভারী ভাবটা আর নেই। দাঁড়াবার সময় শরীরের শুকনো হাড়গুলো একবার মড়মড় করে উঠেই থেমে গেল। খোলটার ফিতেটাকে গলা পার করে কাঁধে আটকে দিয়ে খোলটাকে সামনের দিকে কোমর বরাবর ঝুলিয়ে নিল। খোলটার ডাঁয়ায় বাঁয়ায় চাঁটি মেরে একবার পরখ করে নিল নফর। তারপর ঘর থেকে বেরুল। বেরিয়ে হতাশ হল নফর। কিছুই মালুম হয় না। চোখ বোজা থাকলে যেমন খোলা থাকলে তেমনি। তাছাড়া যাবে কোথায়? কার বাড়ির মড়া। সে সব তো কিছুই জানা হয়নি তার। নফর স্থির দাঁড়িয়ে থেকে এসব ভাবতে থাকে। ঠিক সেই সময় কনুইয়ে কার যেন আঙুলের স্পর্শ পেল নফর। একটা তেঁতুল বিছে যেন তার মনের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। অস্বস্তিকর ভয়ে আঁতকে উঠল নফর। যেন বরফের আঙুল। চামড়া কেটে ঢুকে গিয়ে হাড়ে ঠেকছে। নফর সেই লোকটার গলার স্বরও শোনে—'ভয় নাই। লাও খুলট আচ্ছাসে বাজাও। আর গলা ফাটিয়ে গান ধর।'

নফর অবাক। স্বরটাকে খুবই আপন করে চেনা মনে হল তার। কিন্তু কোথায়…কোথায়…ভাবতে পারে না নফর।—'লাওহে বাজাও'। নফর আর অপেক্ষা করে না। খোল বোল তুলে গান ধরে—কে যায় নদের বাজার দিয়ে আয়রে মাধাই জেনে যা…খোল বাজে দ্রিম্ দ্রিদিম্ দ্রিদিম্…

নফর নিজে ছুটছে না। তাকে যেন ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কনুইয়ে বরফ-ঠাণ্ডা আঙুলের স্পর্শটা রক্ত ছুঁয়ে হাড়ের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে নফরের। যেন বাতাসের আগে আগে ছুটে চলেছে সে। সেই ত্রিশ বছরের যৌবনটাই যেন ফিরে পেয়েছে নফর। হাঁপের সেই অসুখটা, একটু চললে ফিরলে হাস-ফাস শব্দ বেরুত বুক থেকে সেটা আর এখন আসছে না। নফরের কাছে এখন খানাখন্দ চড়াই উৎরাই জল পাহাড় সবই তুচ্ছ। সেই ত্রিশ বছর যৌবনে যেটা বুঝতে পারত নফর ঠিক সেইরকম। বিদ্যুৎগতিতে খোলের চামড়ায় চাঁটি পড়ছে। গলার স্বরটাও যে কাঁসর বাজনার তীক্ষ্ণতা পেয়েছে তা বুঝতে পারে নফর। প্রাণঢালা আবেগে সে গাইতে থাকে—কে যায় নদের বাজার দিয়ে…

এক সময় থেমে যায় নফর। না। নফরকে থামিয়ে দেওয়া হয়। সেই স্পর্শটা আর নেই। নফর বুঝতে পারে সেই ভারী পাথরটা তাকে যেন নিচের

দিকে টেনে নামাতে চাইছে। বুকের মধ্যে সেই হাঁপানিটা আবার জেগে ওঠে। মেরুদণ্ডেও বাঁক ধরে। হাত পায়ে খিল ধরে। অবশ হয়ে ওঠে। খোলের বাজনাটাও থেমে যায়। গানও। পোড়া গন্ধটা নাকে আসে। একটানা পরিশ্রমের অবসাদ তার শরীরটাকে কামড়ে ধরে। চোখ খোলাই থাকে নফরের। শবের চোখের মত মৃত অন্ধকার তার চোখেও। সেই ধোঁয়াটে দৃষ্টির অন্ধকারের ভিতরেও নফর বুঝতে পারে সারি সারি সমাধি, মহাকালের মন্দির, চিতা আর বিশ্রামাগার মৃত অন্ধকারে ধুঁকছে। চিতায় একটি মৃতদেহ শোয়ান হচ্ছে। নফর বুঝতে পারে না এই শবটার পেছনেই কি সে হরিনাম করতে করতে এসেছে। হবেও বা। শবটার আচ্ছাদন খুলে ময়লা জামা কাপড়টাকে ছিঁড়ে টেনে উলঙ্গ করা হল। চোখে ধোঁয়াটে অন্ধকারের ভিতরে সেই মৃতদেহটা নফরের চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চমকে উঠল নফর। কে! কার শব ওটা! নফর চিতাটার কাছাকাছি এগিয়ে গেল। চিতার আলোয় মৃতদেহটা তার চোখে স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ল। আর তখনই একটা ঠাণ্ডা ভয় নফরের হৃৎপিণ্ডে লাফিয়ে উঠল। সেই মৃত্যুশীতল ভয়টা তার রক্তে হিম ছড়িয়ে দিল। ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল নফর। যে ডাকটা তার খুবই চেনা মনে হয়েছিল মৃত মানুষটাকেও সে রকম চেনা মনে হল তার। আর ঐ ডাকটা যে এই মানুষটারই সেটা বুঝতে পারে নফর। সে জানে ঐ মৃত মানুষটাই এতদিন তার রক্ত মাংস মজ্জার হাড়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ে মিশে গিয়ে চলাফেরা খাওয়া ঘুম আর শবদেহের পেছনে শ্মশান যাত্রী হয়ে হরিনাম কীর্তনের ভিতরে এতদিন বেঁচে ছিল। নফরের রক্ত যেন জমতে শুরু করেছে। অথচ বাতাসে সে রকম শীতের ধার নেই। নফরের মনে হল সত্যি সে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কে বাজায়!

—কেউ বাজাবে না রে শালা নিতে? আমি নিজেই বাজাব।

নফর খোলটাকে দুই জানুর উপরে রেখে তার শুকনো কড়াপড়া হাতে বিদ্যুতের গতি এনে ডাইনে বাঁয়ে চাটি লাগায়। দ্রিম দ্রিদ্রিম দ্রিম দ্রিদিম···

পৃথিবীর সমস্ত জীবনের গতি থেমে গেলেও যেন ও বাজনা কখনও থামবে না! সব শেষ বাজনাই বুঝি এ রকম।

———

বুদ্ধদেব কাব্যে বর্ণালী

চিত্রা দেব

বুদ্ধদেব বসু প্রকৃতির কবিরূপে পরিগণিত হননি, তিনি বিদগ্ধ নাগরিক কবি, নগর সচেতনতা তাঁর কবিতার সর্বাঙ্গে জড়িত, প্রকৃতিকেও তিনি দেখেছেন সেই একক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তাঁর রূপসন্ধানী মন সৌন্দর্য আবিষ্কারের নব নব প্রচেষ্টাতেই প্রকৃতির দারস্থ হয়েছে। গোধূলির রঙিন আকাশ ও নীলে-সবুজে মেশা সমুদ্র-মেঘলা-বনানী কয়েকটি কবিতায় বেশ গুরুত্ব পেয়েছে।

"দৃষ্টি অন্ধকরা
উচ্চ চূড়া হীরার পাহাড় ধ্বসে পড়ে; তীব্র নিঃশব্দ প্রপাত
—রঙের উদ্দাম অরণ্য প্রলাপ—
মিশে যায় মুছে যায় আতাম্র পশ্চিমে। দিগন্তের
বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত
একটি দীর্ঘ রক্তরেখা ধূসরিত আকাশের
দীর্ঘ অর্ধবৃত্তে করে দ্বিখণ্ডিত।"

আষাঢ়ের একদিন/বিচিত্রিত মুহূর্ত]

* * *

"নিষ্ক্রিয় মেঘ এখনো থমকি আছে
ক্ষণিক হলুদ সবুজ-সোনায় মেশা
অলীক সন্ধ্যা পুনঃ বর্ষণ যাচে।"

[বর্ষার দিন/শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর]

* * *

"সূর্য ডোবার আবির রঙে হাল্কা ডিঙি নৌকোগুলো
গালফোলা লাল-কমলা পালের ক্ষণলীলায়
মাতলো সন্ধ্যাবেলায়।" [পদ্মা/বিচিত্রিত মুহূর্ত]

* * *

"একবার সাঁওতালী পিঙ্গলরঙ্গী আঁকাবাঁকা
প্রান্তরের দিকে, যেখানে সন্ধ্যার সোনা দিগন্তের
নীলাভ পাহাড় জ্বলে গলে গেলো।" [কবিজীবনী/দময়ন্তী]

* * *

"অপরাহ্ন ছিন্ন অঙ্গ মেখে
সবুজ হলুদ নীলে পশ্চিমে অন্তিম
বাসর সাজালো।" [দময়ন্তী]

সন্ধ্যার চিত্রে একাধিক বর্ণপ্রক্ষেপ ইংরেজী কবিতাতেও দেখা যায় ঃ

"At evening, one is alarmed by such definition
In as many lost greens as one will give glances to recover,
As many again which the landscape
Absorbing into the steady dusk, condenses
From aquamarine to that slow indigo-pitch
Where the light and twilight abandon themselves."
[C. Tomlinson ; Tramontana at Lerici]

মৃদু রঙগুলির ক্রমে গাঢ়তার মধ্যে ডুবে যাওয়ার চিত্রটি বুদ্ধদেবের কবিতার সমধর্মী।

অনুরূপ একটি ঊষা-চিত্রও চোখে পড়ে ঃ

"Phoebus, arise !
And paint the sable skies,
With azure, white and red।" W. Drummond of Haw-thornden : Summons to love]

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "পুবের সবুজে সাদা হয়ে ফোটে ভোরের আকাশ।"

এ কবিতায় কোমল রঙ থাকলেও বুদ্ধদেবের আঁকা গোধূলি বিয়ের রাতের রঙে রাঙা। 'কঙ্কাবতী'র বিভিন্ন কবিতায় প্রিব্যাফেলাইট কবিদের ইতস্ততঃ প্রভাব সত্ত্বেও তিনি য়ুরোপের ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকরদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হননি বরং তাঁর রঙ ব্যবহারে ফবিস্ট ভাবনা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি রঙ সংগ্রহ করেছেন প্রকৃতির কাছ থেকে, 'বন্দীর বন্দনা'য় তার অকপট

স্বীকৃতি ঃ

"আমার চিত্তের বর্ণে মরি মরি কী বিচিত্র চিত্রলেখাখানি
সযত্নে রেখে গেলো এঁকে
এই চিরস্মরণীয় দিনরাত্রি মোর।" [কালস্রোত]

কোন কোন সমালোচকের মতে আধুনিক কবিদের মানসিক জটিলতার পরিচয় বহন করে মিশ্র রঙের প্রাধান্য। বুদ্ধদেব মনে-প্রাণে আধুনিক কবি হলেও অধিকাংশ সময়ে তাঁর কবিতায় অমিশ্র গাঢ় রঙ প্রাধান্য পেয়েছে। লাল-নীল-সবুজ-হলুদ-কমলা-বেগনি প্রভৃতি রঙ দিয়েই তিনি বেশির ভাগ কবিতার ছবি এঁকেছেন।

"আসছে গ্রীষ্ম আসবে আবার কৃষ্ণচূড়ার
উষ্ণশোণিতে, উচ্চ চূড়ার উচ্ছ্বাসে লাল
আকাশের সুখী রেখায়, আসবে শাখায় শাখায়
সবুজ শিখায়, পথে পথে ঝরা আহ্লাদী লাল
হলুদ গুঁড়োয়, চলতি পথের চপল হাওয়ার
উল্লাসে," [ফাল্গুনের গুঞ্জন/দ্রৌপদীর শাড়ি]

আবার ঃ

"মনে হয়েছিল তুমি হলদে সবুজ লাল নীল
উদ্দাম উল্কার চতুষ্কোণ ;" [এরোপ্লেন/শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর]

পুনরায় ;

"তোমার বাঁকা চাঁদ,
রোগা ঝোলা চ্যাপ্টা চাঁদ, শাদা, সবুজ, হলদে, ঊর্বশীর রূপের
মতো নিলর্জ্জ," [রাত্রি/একদিন চিরদিন]

কয়েক জায়গায় বুদ্ধদেব রঙ সৃষ্টিতে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমুদ্র নিয়ে দেশে-বিদেশে বহু কবি ভালো কবিতা লিখেছেন তবু বুদ্ধদেবের কবিতায় সমুদ্র রূপে রঙে স্বতন্ত্র।

"দ্যাখো না সমুদ্র তোমার কী করে—
এই লোনা নীল জল আর চাবুকের মতো হাওয়া।
যেমন শঙ্খ আর ঝকঝকে ঝিনুক
এই ঢেউয়েরা হাজার বছর ধরে আঁকে
কত অফুরন্ত রঙে, কত বিচিত্র নকশায়,
বাদামী আর বেগনি আর অপরূপ মসৃণ
আর আঁকা বাঁকা ঢেউ খেলানো রেখায়—

তেমনি তারা তৈরি করুক তোমার শরীরকে

শঙ্খের মতো মসৃণ তোমার শরীর—" [সমুদ্র স্নান/নতুন পাতা]

রঙকে বুদ্ধদেব খোঁজেন না সর্বত্র তিন রঙ দেখতে পান। প্রতিদিন তাঁর চোখে পড়ে রঙের খেলা—"মৌরীর হলুদ রৌদ্রে সুবাসিত মহিলার নাম", "ধূ-ধূ ধূসর জলে জড়ায় লাল মাটির রং", "বালু-বাদামী জল", "হলদে গোলাপি মুখ", "ময়ূরকণ্ঠী মেঘ", "সোনালি সবুজ মাঠ", "সূর্যাস্তে হলুদ আলো", "পীত লোহিত সন্ধ্যা", "আগুন রঙের বাঘ", "গাছে গাছে সবুজের স্রোত" "সবুজ বিনুনি", "মেঘ নীল নয়ন", "নরম নীল", "কৃষ্ণানিশির কালো", "অভ্রশুভ্র কৈশোর", "বাসন্তী বাসনা", "আকাশের নীল বেড়া", "চা বাগানের কোঁকড়ানো সবুজ নীল", "সূর্য-শুভ্র পাণ্ডুলিপি", "অভিজাত নীল নাক", বৃষ্টিতে ধূমল বাঁশবন", "দুধ রঙের কুয়াশা", "ছাইরঙা টুকরো বরফ", "মেঘের রঙে মাটির রঙে ঢলাঢলি", "মেঘলা রঙের মেঘনা" প্রভৃতি অজস্র রঙের সমারোহ। শুধু কবিতাতে নয় বুদ্ধদেবের গদ্য রচনাতেও রঙের অকৃপণ ব্যবহার প্রমাণ করে তিনি কত বড়ো বর্ণপ্রেমিক। মন্তব্যের সমর্থনে আমাদের আবার বুদ্ধদেবের গল্প-প্রবন্ধের সাহায্য নিতে হবে। দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ

"পূবে-পশ্চিমে দীর্ঘ চলে গেছে উদারবক্ষ রাসবিহারী অ্যাভিন্যু, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রৌদ্রে অবারিত—সারাক্ষণ আমাদের চোখের সামনে—তার ধূসর বর্ণ বৃষ্টির জলে উজ্জ্বল, জ্যোৎস্নায় ইস্পাতের মতো নীলাভ, স্তব্ধরাতে আধো অন্ধকারে স্বপ্নিল। সত্যি যেন অ্যাভিন্যু—বীথিকা—এত তরুপল্লব চারদিকে, পড়ে থাকা শূন্য জমিতে অবিরল প্রাক নাগরিক নারকেল সুপুরি আর ফুটপাতের ধারে ধারে সম্প্রতি রোপিত বৃক্ষশ্রেণী—সুন্দর সুগন্ধী ও বর্ণাঢ্য। চৈত্রের সকালে হালকা একটি সুগন্ধ ভাসে বাতাসে, গুলমোর অথবা অ্যাকোশিয়ার গুঁড়োয় হলুদ হয়ে থাকে আমাদের সরু বারান্দাটি; ঘরে বসে দেখি সারা সিঙ্গি পার্ক কৃষ্ণচূড়ায় লাল হয়ে আছে। রাস্তায় বেরোলে ঘাসের গন্ধ, ফুলের গন্ধ—ঋতুভেদে বকুল অথবা কদম্বের—আর বর্ষায় ট্রাম লাইনের দু'পাশের ঘাস এত ঘন ও পীন ও রোমশ যেন চোখে দেখেই স্পর্শ পাওয়া যায়। [আমার যৌবন]

ক্রমশঃ

● বিশেষ আলোয়

শিশির ভট্টাচার্য

১৩৭৫-এর রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রকাশিত হয়েছিল শিশির ভট্টাচার্যের প্রথম কবিতার বই। কফি হাউসের সেই লোকটা। বই নয়, সংশোধন করে বলি, পুস্তিকা। দাম পঞ্চাশ পয়সা। যা পথ চলতে চলতে যে-কোনো মুহূর্তে হাত থেকে গলে যায়, কিন্তু গলে যায় না কফি হাউসের কোণে বসে থাকা লোকটার স্বভাবের ভাবনা। এমন লোক শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে আছে একথা ঠিক, অথচ সে যে 'পরমবক' অথবা 'জরদগব' 'আলো জ্বালাবার কিছু' না দেখেও যে তার মন নাচে কোন এক অজানা আশায় (আশংকায় নয়), এই সত্যটা কবিতার মধ্য থেকে উঠে এসে মনকে স্পর্শ করে।

দশটি কবিতা। কোন্‌টি সবচেয়ে ভালো? বারো বছর আগের ভাবনা-চিন্তাতে কবি যেগুলিকে কবিতা মনে করে নির্বাচন করেছিলেন, এখন কবি স্বয়ং তাদের সবকটিকেই 'কবিতা' বলবেন কিনা সন্দেহ আছে। কবিতার সংজ্ঞা নেই, কবিতার পথনির্দেশও নেই। মনের মধ্যে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয় একটা—কিছু একটা। কখনো কখনো তা মূর্ত হয় কবিতায়। 'স্বপ্ন' কবিতাটি তা-ই। ছন্দে, ভাবনায়, শব্দচয়নের প্রয়াসী সাবধানতায় এটি দশটির অন্যতম। গঙ্গাফড়িং'-এর প্রথম তিন স্তবক যে আবেদন রাখে কানের কাছে, শেষ স্তবকটি কণ্ঠকল্পিত অর্থে ও কণ্টার্জিত শব্দে তাকে শেষ পর্যন্ত এ্যাণ্টি কবিতা করে তুলেছে। বরং 'গোওনদোলা' কবিতাটি মনের কোণে 'ছিপখান তিন দাঁড় দেয় দুরপাল্লা'র স্মৃতিকে হাজির করলেও স্বকীয় ভঙ্গী ও বর্ণনায় উজ্জ্বল। তীব্রগতি নৌকোর মতোই তরতরে ও ঝরঝরে।

পুস্তিকাটিতে দার্শনিক ভাবনা যে কিছু নেই, তা নয়। এই পর্যায়ে পাঠকরা পাবেন কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথ, মানুষের আত্মা সব মরে গেছে, মানুষের মন যদি মরে যায়, একটা গল্প ছাই। ভাবনাতে এগুলি সবই উঁচুমানের প্রকাশে তত উজ্জ্বল নয়। প্রথম রচনার পরিশ্রম এবং উত্তেজনা দুইই মিশিয়ে আছে। সহজ নয়, সচ্ছন্দ নয়। অতি সহজ গদ্যের মত হয়ত বা।

আমার কাছে সবচেয়ে ভাল কবিতাটির নাম—'বলে যেও'। এর বক্তব্যের

উপস্থাপনার রীতিটি একেবারে কবিতার মতো। কোনো দ্বিধা নেই, শব্দগুলো যেন হাত বাড়িয়ে ধরা দিয়েছে কবির কলমে। কবির একটি বড় গুণ চোখে পড়ছে—সে হলো তাঁর সংযম। অনাবশ্যক দীর্ঘ করেন নি কোনো কবিতাকে। পুনরাবৃত্ত করেন নি কোনো বক্তব্যকে। 'বলে যেও' কবিতাটি সম্পূর্ণ আত্মগত। যে কথা বলা যায় না, তাই বলবার অনুরোধ। প্রথম কাব্যগ্রন্থেই এই কবিতাটির অন্তর্ভুক্তি এই প্রতিশ্রুতিই দেয় কবির সম্পর্কে যে, তিনি ভবিষ্যতে আরো অনেক ভালো ভালো কবিতা লিখবেন।

ঠিক তাই। এক বছর পরেই (অংকের হিসেবে প্রায় দু'বছর) ১৩৭৬ সালের চৈত্র মাসে বাক্‌সাহিত্য প্রকাশ করলেন কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, 'কখনো মুহূর্তের আলো'। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে উৎসর্গ করেছেন কবি। এ বইও বেশ কিছু ভাল কবিতা রয়েছে। মোট কবিতার সংখ্যা বত্রিশ। বই খুললেই বোঝা যায়, পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থের কবির ভীরু স্বভাব একেবারে নেই। লেখায় মুন্সিয়ানা এসেছে, ছন্দেশব্দে – অর্থে বেশ স্বকীয়তার প্রকাশ ঘটেছে।

যে কথাটা এই লেখার দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে আমি বলেছি নিতান্ত অকবির মত—'মনের মধ্যে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয় একটা—কিছু একটা'—সেই কথাটাই কবির কলম কবিতার শব্দে বইয়ের নামকরণ করেছে। 'কখনো মুহূর্তের আলো।' কিছু একটা নয়, সত্যিই সেটা আলো, এবং এক মুহূর্তের, নইলে হঠাৎ উদ্ভাসের স্বাদ পাবেন কেমন করে কবি? যদিও ঐ শিরোনামের কবিতাটি (শেষ কবিতা) বুঝি বা বলতে চেয়েছে অন্য কথা। এবং আমার স্থির বিশ্বাস, নির্বিশেষ নামকরণটি এই বিশেষ কবিতায় প্রযুক্ত হয়ে তার নিজস্ব অর্থকে অনেকখানি সংকুচিত করেছে। যা হতে পারত সর্বময় তা হয়েছে একান্ত। এতে ঐ বিশেষ কবিতার কোনো ক্ষতি হয়নি, শব্দের ব্যাপ্তিকে বেঁধে দেওয়া ছাড়া। কবির সব কবিতাই কি 'কখনো মুহূর্তের আলো'র চমকে জন্ম নেয়নি?

প্রকৃতির সঙ্গে যোগ প্রায় সব আধুনিক কবিতাতেই অনুপস্থিত। শিশির ভট্টাচার্য তা থেকে ব্যতিক্রম। মানুষ ও তার মনের ভাবনা তাঁর অনেক কবিতার বিষয়বস্তু হলেও প্রকৃতি বা নিসর্গ তাঁর চোখকে মুগ্ধ করে। তারই প্রকাশ অনবদ্য শব্দচয়নে, প্রকৃতির কোলের থেকে ছিঁড়ে নেওয়া দৃশ্য বর্ণনায়। 'তোমার দু চোখে' 'বাঁকটা পেরোলেই,' 'ছবি', 'লেকে একটি সন্ধ্যা,' 'আমি জানতে পারিনি,' 'মাঝেমাঝেই' প্রভৃতি কবিতা এর অন্তর্গত। কবিতাগুলিতে

নিসর্গ বর্ণনায় এমন একটা আন্তরিকতা আছে যা গ্রাম্যমনের দোসর। আনসফিস্‌টিকেটেড। গুণবাচক বিশেষণ এটি। 'ছবি' কবিতা নয়, একটি চলচ্চিত্র। পাঠকের মনকে একাগ্র করে তোলে। শব্দে কবিতার ছন্দ ও গতি প্রায় অনুপস্থিত। যা উপস্থিত তা দৃষ্টিগ্রাহ্য, শ্রুতিগ্রাহ্য নয়।

সোনালি দিনের সব প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও তা এখনো দূরস্থিত, এমনকি সংশয়িত, এই ভাবনার ফসল 'যদিও'। 'কোথায় যেন দিনের সুরু'—কবিতার বেগ ও আবেগ, দর্শন ও মনন সবই রোমান্টিক স্পর্শাতুর।

শিশির ভট্টাচার্যের অনেক কবিতায়ই তুমি—মানে ঈশ্বর। আস্তিক্যবাদী কবি। যদিও আশাহতের বেদনা কলমে প্রায়ই উৎসারিত। 'তোমার কাছে কোনোদিনই'—না পৌঁছাতে পারার বেদনা এবং পৌঁছানোর বাসনা যে আশ্চর্য পংক্তিকটির সৃষ্টি করেছে তা সুন্দর। ছুটির নিমন্ত্রণ থাকলেও বয়স্ক ইচ্ছার চাপে পিঠ নুয়ে যায়, পৌঁছানো হয় না। অথচ তিনি ডাকেন, হাতছানি দেন নানান সাজে। বুকের কঠিন কান্নায় তাঁর মনে হয় 'তুমি এসে বুঝি ফিরে গেলে' (ঋতুবদলের পালা)। 'ধীরে সন্ধ্যা আসে'—এই প্রত্যাশায় কবি থাকেন, এই ভাবনা কি মৃত্যুর ভাবনা? কেন? অথচ দ্বিতীয় কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। কয়েকটি লাইনের গভীর উচ্চারণ ঐ এক পরিণতির দিকেই মনকে টানে, 'আলো নেভা নক্ষত্রেরা যেই/একে একে খসে পড়ে মহাকাশে/ অনিবার্য পতনের পরে।' কিংবা 'অথবা যেখানে/মৃত্যুর নিথর চোখ/কোটি বর্ষ জেগে থাকে/জীবনের শিয়রেতে বসে/সূর্যমুখী সূর্যের ছায়ায়।' ইত্যাদি বাক্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এবং কবির প্রত্যাশা—সন্ধিলগ্নের—বিষণ্ণ ভাবনায় প্রতিফলিত। এতক্ষণের অন্য কবিতার প্রকৃতি-তন্ময়তা, এই কবিতায়, গাঢ় রঙে, মৃত্যুর রঙে রঞ্জিত। এই কবিতাটির ঠিক আগের রচনাটি (আমার ইচ্ছার ভাঁজে) যেন এরই প্রস্তুতি। কবিতাটি সুন্দর।

কবি যে একক নন, তিনি যে অগণিত মানুষের মিছিলের একজন, তাঁর ইচ্ছা যে অতি নিভৃত হলেও অনেকের ইচ্ছার সগোত্র, তা কি অনায়াস ভঙ্গীতে এবং নিরহংকার উক্তিতে প্রকাশ করেছেন 'এই তো আমার' কবিতায়। 'এইতো আমার ইচ্ছেগুলো/সীমাহীনের পায়ের ছাপে/আবার পায়ের চিহ্ন রাখা—' এই বাক্য কবিকে সচেতন কবি করে তুলেছে। এটি মহৎ কবির লক্ষণ। এই কবিতায় সমকালীন জীবনের প্রতিচ্ছবি আছে।

ভগবানের রূপচিন্তায়, তাঁকে ম্যাজিসিয়ান করে এবং বর্তমান জীবনের

সংগ্রামে নিত্য পরিবর্তনশীল জগতের সবখানে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে যে কবিতার জন্ম দিয়েছেন তিনি (মনের মধ্যে ম্যাজিসিয়ান), তা সুখপাঠ্য, দার্শনিক, জীবনবোধে উদ্দীপ্ত, গতিময় এবং ছন্দময়। কোনো গুণের অভাব নেই। বিশ্বাসের পরম যাদুতে নিঃসঙ্গ একাকী মানুষের কান্না মুছিয়ে দেওয়া যায় এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন তিনি শেষ পংক্তিতে। 'রাত্তিরেতে যখন একা/অন্ধকারটা ভীষণ কাঁদে/যাদুদণ্ড হাতে তুমি/মনের মধ্যে ম্যাজিসিয়ান।' ম্যাজিসিয়ানের রূপকে তাঁকে না আনলে আর সাদামাটা কোন পথে পৌঁছানো যাবে অমৃতলোকে? অনেকগুলি ভাল কবিতার মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ কবিতা।

সম্পূর্ণ কবিতা হয়ে ওঠেনি, কবিতার বীজ বা অংকুরিত কবিতার অবস্থায় আছে এমন দু'একটি রচনাও আছে। তথাপি, পূর্ববর্তী পুস্তকের তুলনায় এটি অনেক উজ্জ্বল গ্রন্থ।

এর পরেই 'অনন্য প্রকাশন' প্রকাশ করেছেন শিশির ভট্টাচার্যের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। ১৩৭৯-এর শ্রাবণে—প্রায় তিন বছর পরে। সুন্দর কাগজ, মনোলোভা মুদ্রণ ও অলংকরণ। প্রকাশক ধন্যবাদার্হ। কবি, তাঁর বাবার উদ্দেশে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন। এ বই-এ কবি প্রতিষ্ঠিত।

মোট একত্রিশটি কবিতার একত্রীকরণে এই কাব্যগ্রন্থ (তবুও তোমার নামে) প্রথম নিশ্চিতভাবে শিশির ভট্টাচার্যকে কবি হিসেবে চিহ্নিত করে। শব্দচয়নের কৌশলে এবং উপমার যাদুপ্রয়োগে প্রায় সব কবিতাই বুকের মধ্যে ঢেউ তোলে। বিশ্বাসী করে তোলে।

'প্রিয়তম মুখগুলি' কবিতায় যে চিরন্তনী সুর বাজে তার মাধুর্য স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এই কবিতার প্রত্যেক লাইনের বহুবচনান্তিক 'গুলি' শব্দটি কানকে পীড়া দেয়, কাবতার গতিকে ব্যাহত করে। 'হঠাৎ অবাক চোখ'—প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করেও কবিতার পূর্ণ মর্যাদায় আসীন। এর ছন্দ নতুন, অনভ্যস্ত কানে তার ধাক্কা বাজে ঠিকই, তবু গতিময়। 'কথা ছিল'—কবিতাটির কয়েকটি লাইন উদ্ধার করতে মন চায়—'কথা ছিল/ঝাপসা বুকে অনেক দুখের ঘ্রাণপাকের/বিবর্ণ রং ধুলোয় ছেনে রক্তগোলাপ ফুল ফোটাবে।/শালের বনের দীর্ঘ বাহু মহুয়ামন পোষ মানাবে।···কথা ছিল/সাগরভরা তৃষ্ণা ছুঁয়ে ওষ্ঠপুটে,/অহংকারী রৌদ্র থেকে অন্ধকারের দুঃখ নেবে।···কথা ছিল শেষ বিকেলে সূর্যমুখীর আকাঙ্ক্ষাতে/ভাসিয়ে

দিয়ে স্মৃতির জাহাজ নীলকণ্ঠ সঙ্গী হবে।' এক রোমান্টিক প্রাণময় এবং কবিতায় তন্ময় কবির কলমছাড়া এরকম লেখা বেরুতেই পারে না।

দার্শনিক কবিতাগুলিও কিছু কম রসোত্তীর্ণ নয়। উদাহরণত বলা যেতে পারে 'সময় তেমন কিছু' কবিতার কথা। 'ফিরে দাও' আবেগময়। 'শেষ দৃশ্যে পালাবদলে' কবি কি একটু সতর্ক বিদ্রোহী? যেন বিপ্লব বা বিদ্রোহের সুর না লাগালে 'পালাবদল' কথাটার ভারসাম্য থাকে না! তাই, 'কম্বুকণ্ঠ', 'বজ্রমুঠি,' 'উড়ন্ত নিশান', 'ক্ষুধিত শপথ' এইসব সদাপ্রচলিত শব্দে ভীড়াক্রান্ত এই কবিতা। 'কোথায় ওপার বাংলায়' কবির অকৃত্রিম প্রশ্ন ধ্বনিত হয়েছে যুক্তিগ্রাহ্য পটভূমিকার এবং চিত্তগ্রাহ্য শব্দচয়নে। 'আবার ঘুরছে ইতিহাস', 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সমগোত্রীয় কবিতা, মনে হয় সদ্যপ্রসূত বাংলা দেশকে(১৯৭১) সামনে রেখে লেখা।

'আমার মেলা ডানার নীচে' কবিতায় রোমান্টিকতা এবং দার্শনিকতা একাকার হয়ে কবিতাটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। 'হেমন্তের বিষণ্ণ বিকেলটুকু' ও একই রকম কবিতা হতে পারত কিন্তু এর শব্দ ও ছন্দ দুটোই গদ্যকে অতিক্রম করতে পারে না। বাক্যের রচনা বা সজ্জাশৈলী চমক আনে বটে তবে তা কৃত্রিম চমক।

'বদর বদর সামলে যেও নাও' কবিতার মধ্য স্তবকটি উদ্ধৃত করলেই কবিতার মধ্যস্থিত রস উদ্ভাসিত হয়।

'সফলদিনের বিফল স্মৃতি
খুঁজো না আর কেউ
দীঘির পরেই নয়নজুলির বাঁক।
সাবধানেতে এড়িয়ে যেও ইচ্ছেগুলো মুড়ে
উথালপাথাল ঢেউ-এর ছলাৎছল।'

এ ছাড়াও, শেষ স্তবকে 'গহীন রাতে আকাশপারের শেষ তারাটি চিনে'—নাও সামলে যাবার নির্দেশ দেওয়া আছে। কবিতাটি রসোত্তীর্ণ। এবং গভীর।

সব কবিরই যেমন থাকে, এই কবিরও বোধহয় তেমনি কোনো গভীর গোপন দুঃখ আছে। অন্তত, 'যাদুঘর', 'এইখানে আয়নায়', 'সহজ হারায় অনুভাসের মায়া', 'কথা ছিল', 'যেহেতু সময়ের সঙ্গে', 'রূপকথা' এবং 'বৃষ্টি নামে হঠাৎ যখন' কবিতায় তার অস্পষ্ট ছাপ আছে। কোথাও অর্ধউচ্চারিত,

কোথাও সোচ্চারিত। এসব কবিতার যে বাক্যগুলি হৃদয়কে স্পর্শ করে তা হল—

১। এবং ঝড়ের চিহ্ন, তাও থাকে যন্ত্রণার মতো—সুগভীর ক্ষত (যাদুঘর)

২। আর হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া (এইখানে আয়নায়)

৩। মেঘবিকেলে গাঢ় স্মৃতির কত বকুল ফুলে/আধফোটা সব ইচ্ছেগুলো ঝরে। (সহজ হারায় অনুভাসের মায়া)

৪। শূন্য করে/কপাল থেকে/স্বেদের লবণ/মুছিয়ে দেবে। (কথা ছিল)

৫। আসবে নিয়ে/জ্যোছনা রঙে/রাঙিয়ে রাখি/সুখের পাখি/স্বর্গমর্ত্য পাতাল ঢুঁড়ে/ভালবাসার দ্বীপান্তরে/অভ্রভেদী আনবে খুঁজে সবুজ বনের প্রতিশ্রুতি (কথা ছিল)

৬। অনবরত স্মৃতির লড়াই (যেহেতু সময়ের সঙ্গে)

৭। রাঙচিতার ও বেড়ার ধারে/পঁচিশ বছর বন্ধ দুয়ার/একটি কিশোর বিষণ্ণতা/বুকের চিহ্নে/রেখেই গেলাম। (রূপকথা)

৮। বানপ্রস্থে নিঃস্ব পথিক (বৃষ্টি নামে হঠাৎ যখন)

এ গ্রন্থে, শেষ পর্যায়ের তিনটি কবিতাই অসাধারণ। 'মধু কবি', 'রবীন্দ্রনাথকে' এবং 'তুমি'। এর মধ্যে মধুকবির উদ্দেশে নিবেদিত রচনাটি প্রচলিত প্রথাকে অতিক্রম করতে পারেনি। শেষ কবিতা 'তুমি' সুন্দর। ঐশ্বরিক। মনের অস্তিত্ব যেমন সন্দেহাতীত অথচ তার নাগাল পাওয়া অসাধ্য, 'তুমি'ও তেমনি। এক ঐকান্তিক আস্তিক্যবোধ থেকে এবং প্রেম থেকে এ কবিতার জন্ম। এর উপমা ও শব্দগুলি অনন্যসাধারণ। এই পর্যায়ের মাঝের কবিতা 'রবীন্দ্রনাথকে' সর্বোত্তম। কত সহজ চিন্তা ও স্বচ্ছ ভাষায় একটা কঠিন বোধকে তিনি প্রকাশ করেছেন তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। রবীন্দ্রনাথকে 'দুর্বোধ্য', 'অসাধ্য', 'মহত্তম', 'অননুকরণীয়'—ইত্যাদি নানান আখ্যায় অনেকেই ভূষিত করেছেন। সকলেই কবীন্দ্রের প্রতিভার কাছে বিস্মিত এবং নতজানু। এ কবিও তাই। কিন্তু, কি সরল আত্মসমর্পণ। যেন সম্রাটের মতন সত্যস্বীকার। মন্ত্র উচ্চারণের মতন বিশুদ্ধ। ভাবছিলাম কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করি। কিন্তু পারলাম না। গোটা কবিতাটাই উদ্ধৃতির যোগ্য। বারবার পাঠ ও আবৃত্তির যোগ্য। 'সাধ্য নেই তোমাকে এড়াই।'

পুনশ্চ—লেখা শেষ হয়ে যাবার কিছুদিন পরে শিশিরবাবুর চতুর্থ

কাব্যগ্রন্থ—'শব্দের মিনারগুলি' হাতে এল। ছত্রিশটি কবিতা। রোমান্টিক দার্শনিক, জীবনী ও প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা এর বেশির ভাগ স্থান অধিকার করে আছে। এখন আর সন্দেহ থাকে না শিশিরবাবু নিশ্চিতভাবে আশাবাদী ও আস্তিক্যবাদী কবি। পূর্বজ তিনটি বই তাঁকে যে পথ চিনিয়ে দিয়েছে, কবি সেই পথেরই অন্তে যে ধ্রুবতারা আছে তা দেখতে পেয়েছেন। এবং এই বিশ্বাসে লেখা কবিতাগুলির মধ্যে যেগুলো উজ্জ্বল তারা হল—পরীদের দেশ, অহংকারী রাজা, আলেয়া, সূর্যমুখী পাওয়া, হে মধু তোমার নামে, অন্ধকার ছাতে, আমি দেখতে পেলাম, মহেশতলার বাস ছেড়ে যায়, প্রতিধ্বনি এবং সর্বশেষ শব্দের মিনারগুলি।

কাব্যের নাম 'শব্দের মিনারগুলি'। মনে হয় সচেতন প্রজ্ঞায় শিশিরবাবু প্রায় নিশ্চিত যে তাঁর কবিতায় শব্দ যেমন ভাস্বর, অর্থের ব্যাপকতা তেমন সুদূর ও গভীর নয়। বাস্তবিক শব্দের আকাশছোঁয়া মিনার তার শ্রুতি-মাধুর্যে এবং ছন্দের দোলায় যে আরাম এনে দেয় তাঁর অধিকাংশ কবিতায় তা বিস্ময়কর। একটি রোমান্টিক মন নিয়ত কষ্ট পায় অথচ তার পথের শেষ না দেখে ছাড়ে না এমন বোধসম্পন্ন কবিতার সংখ্যা বেশ কয়েকটি। ধূসর কৈশোরস্মৃতি অথবা লাঞ্ছিত ভালবাসার অপমান ক্ষণে ক্ষণে চমকে দেয় ব্যথা দেয় কিন্তু তার শেষে একটি বিস্ময়জাত মিলনইঙ্গিতের দেখা মেলে প্রায় সব কবিতাতেই। কবিতায় শব্দরাশি তার ব্যঞ্জনায় ও বক্তব্যে ফাঁক রাখে না, দ্ব্যর্থবোধক কবিতার ঠাঁই প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থপ্রসারে যে-সব কবিতা দার্শনিক হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে 'আমি দেখতে পেলাম' মহার্ঘ্য। কিন্তু সবচেয়ে দাগ কাটে, রোমান্টিক ব্যাখ্যার 'কবিতা', 'প্রেম মানে কি', 'প্রেম নামক একটি শব্দ' এবং 'সুখের দোসর দুখের দোসর।'

কবির কলম থেকে যখন কোনো উপমা বেরোয় তখন তার মধ্যে একটা স্থায়ী চমক থাকে। এমন অনেক উপমার জনক শিশিরবাবু। 'স্টেশন'—যার অর্থ খুব স্বাভাবিক ভাবেই গন্তব্যস্থান—কবির যাদুব্যবহারে অব্যর্থ হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ শব্দের মিনারগুলির কবিতায় 'দেবদারু আকাঙ্ক্ষায় আলোকিত জংশন স্টেশান'-এর 'দেবদারু আকাঙ্ক্ষা'—যে গগনচুম্বী আশা জাগায় মনে তার কোনো তুলনীয় লাইন এই মুহূর্তে মনে আসছে না। 'ক্ষুধা' কবিতাটিতে একটু সামান্য মনোযোগ ঘটলে এটি একটি নিটোল সনেট হতে পারত। নাকি সচেতনভাবেই কবি নিটোল সনেট থেকে এটিকে দূরে রাখতে

চেয়েছেন ?

জীবনীমূলক কবিতাতে, মধুসূদন, কবির খুব প্রিয়। আগের কাব্যেও তার পরিচয় ছিল, এ গ্রন্থেও, 'সতত হে নদ' এবং 'হে মধু তোমার নামে' তাঁর মধুপ্রীতির পরিচায়ক। দুটিই সুন্দর। দ্বিতীয়টি ব্যঙ্গ-রসাক্রান্ত। কিছুটা আত্মসমালোচনাও। যদিও আলোচ্য কবি লক্ষ্যের বাইরেই প্রায় অবস্থান করেন। কবি যেমন সচেতন আছেন তেমনিই যেন থাকেন এই আমাদের কামনা।

—সব্যসাচী রায়চৌধুরী

———

● কবিতা

লালী বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মাবধি প্রতিদ্বন্দ্বিতা

জন্মাবধি প্রতিটি মানুষ মানুষের জন্য
তবুও দেখা যায় প্রতিদ্বন্দ্বরীতা।
হয়তো কোন ভুলবশতঃ
আমার চোখে বিষণ্ণ বিকেলের
ক্লেদাক্ত মুখ গোপন স্বপ্নের মতো
জন্মলাভ করে।
আমার রক্তে, শিরায়, অস্থিতে—
জীবন মৃত্যু মুখোমুখি যুদ্ধ ঘোষণা করে
ফেনিল সফলতা অথবা
ইস্পাত সম বঞ্চনায়।
এই দেহ হয়তো একদিন
স্বাভাবিক জীবন ছিন্ন করে
স্তব্ধতায় শুধু প্রার্থনা করবে
প্রশ্নাতীত ইতিহাসের
এক নতুন অধ্যায়ের জন্য।

জগন্ময় মজুমদার

মমিবৃক্ষ

ম্যানো এক ভাস্কর্য মৃত ন্যাড়া এই বিশুষ্ক শাখার গাছ
খাঁজে খাঁজে শীতের কুয়াশা মাখা
শ্বেতশুভ্র কফিনের মতো শাদা জ্যোৎস্না মৃত্যুর উৎসব
সুন্দরের মৃত্যুও কতো মহিমান্বিত উজ্জ্বলতা ধরে রাখে।

দ্রাবিড় সভ্যতার মতো প্রাক্তন ঐশ্বর্যবিভব
য্যানো পান ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীলিমার মদির আসর
ক্লান্ত ডানার ভাঁজে ভাঁজে মরশুমি জীবনের নীলাভ লেফাফা
অস্ফুট বলে দ্যায় ঃ তবু মৃত্যু নেই, আমার শেকড়
নিয়মিত অনিয়ম মেনে খুঁড়ে চলে লুপ্ত সুপ্ত আর্য শহর
প্রাচীন স্নানাগার থেকে চুরি করে তুষার স্নান
য্যানো নগ্নবীজি উদ্ভিদের মতো ঝিরিঝিরি গেয়ে ওঠে বৃষ্টিতে গান
কেবল পাল্টায় বনভূমি ;
রেখে যাওয়া মাটির মর্ম ফুঁড়ে বীজবায়ুপ্রাণ
আবার উঠবে জেগে খনিজের
গন্ধমাখা জীবাশ্মের ঘ্রাণ
তার উদ্ধার ঃ মমিবৃক্ষের শব—তার গান—

আজিজুর রহমান মোমিন

একমাত্র বারুদের গন্ধই

আমাকে স্পর্শ দিলে খরা বরং বাড়বেই
ঝলসে যাবে কোমল বুকের তরু এবং হাত
আমাকে কাছে টানলে জ্বালাই বাড়বে শুধু
গহীনের পোড়া ক্রোধ মাথা উঁচিয়ে অবিরাম
আদি সমাজ বৃক্ষের শাখা পত্র পুড়বে।

ভালোবাসা এখন ধ্বংসের জন্যে নিবেদিত
বিধ্বস্ত তারুণ্যে রক্তপাত ও প্রবল বঞ্চনা নিয়ে
আমি যোদ্ধা হতে চাই
কবিতার চেয়ে ঢের ভালো বিস্ফোরণের স্ফুলিঙ্গ

একমাত্র বারুদের গন্ধই জন্ম দিতে পারে
আগামী দিনের জন্যে নতুন কবিতা।

মনোজ রাউত

যাবো

বেড়াতে যাও যখন সাবলীল ঋতু উচ্চারণে
হিমানী দাঁড়িয়ে থাকে অই দূরে বাঙ্ময় শিল্পরীতির মতো
তুমি ছিলে একদিন এইরকম পার্শ্বস্থ বৃক্ষের উচ্চারণ
অবলীলায় শুদ্ধ প্রবহমান নীরবতা একা খেলা করে
নৈঋতে ও প্রবাহে…

আমাদেরও খেলা ছিল, জাহাজে, বেলা অবেলায়
নদীর নিয়ন্ত্রণ ছিল উপমার বুকে
অলংকার আজ নয়, কারুকার্যে শিল্প আছে

মেটেলি উপসংহার টেনেছ এত আগে
ওখানে দেশী মদ টানছে মদেশীয়া যুবক যুবতী
মাদল বাজলেই উৎসবে যাবো আমরা
কলঙ্কিনী তুমি অরুন্ধতী
সিক্ত উচ্চারণে সবিতার কাছে যাবো
তোমাকে দেবো তিল ও তণ্ডুল, আগামী পৃথিবী
রহস্যজনকভাবে বিজ্ঞানের বল ছুঁড়ে দেবে প্রকৃতিবিজ্ঞানী
হারে রে…তখনও জঙ্গলে সারাদিন, উৎপাত…

অভিজিৎ ঘোষ

প্রেম বিষয়ক কবিতামালা

বসন্ত এসেছেন
প্রিয়তম ঋতুরাজ বসন্ত এসেছেন।

যৌবনের অন্তরঙ্গ নদীতে
হলুদ শাড়ী খুলে স্নান করছে
কিশোরী গাছেরা

টইটুম্বুর বুকের কানাচে
ফুটিয়েছে জ্বলন্ত গোলাপ

এতদিন যার কথা ছিলো এখানে আসার
ভূগোলের ল্যাণ্ডস্কেপ পাল্টিয়ে
সে এসেছে আজ

এখন বীজমন্ত্রে তার অভিষেক হোক
জয়ধ্বনি হোক

শাদা রাজহাঁসের মতো রজনীগন্ধারা
দ্যাখো কেমন দুলে উঠছে
দুলে উঠছে
এই পূর্ণিমায়…

আনওয়ার আহমদ

রেলগেট

দৌড়াচ্ছ দৌড়াও
কেউ কিছু বলবে না
পাল্টাচ্ছে পাল্টাও
কেউ বলবে না—'না'
ঘাম ঝরতে ঝরতে
থামবে একদিন।

রেলগেট টপকানো সহজ নয়।

আইল্যাণ্ড থাকলেই
অ্যাক্সিডেণ্ট বন্ধ হবে
ঠিক নয়
যাও গুলিস্তান
কিংবা ফার্মগেট, নয়' মার্কেট

দেখবে তিনটে রাজহাঁস,
একটা শূকর, পাঁচটা মিনি বেড়াল
মুখ থুবড়ে আছে মানচিত্রে।

এটা কৃষ্ণচূড়ার মৌসুম।

এ শহর এখন লালে লাল
রক্তে ঘামে বৃষ্টিতে……
এখনি সময়
রেলগেট টপকাবার।

নিখিলরঞ্জন মাইতি

হলুদ বনে হত্যা

কয়েকটা হলুদ ফুলে
বিকেলের রং
নিরন্তর চেয়ে থাকা
আদিম ইশারা
ভোমরাটা এখনো উড়ছে—
দিন রাত গান গায়
গুন্-গুন্-গুন্
কাকে যেন খুঁজছে যে
চিরদিনই খুঁজতে থাকবে
কারণ ঃ একটু আগেই
হলুদ বনে গুপ্ত হত্যা।
নিজেকে প্রশ্ন করলাম ঃ
আমি বেঁচে আছি তো !!

বরুণ মণ্ডল

বিশ্ব আমার

শুধু আমার দিন আর রাতগুলো তোমায় দিতে চেয়েছিলাম
তোমায় চাইনি কিছু
কিন্তু তুমি, আমার এই চাওয়ার দিলে না কোন দাম
ভুল বুঝলে আমায়,
ভাবলে পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য
আমার সব খেলা পিছনে ;
অথচ দেখলে না খেলার সামগ্রী হারিয়ে আমি এখন নিঃস্ব
অবশ্য এ আমার অভিযোগ নয়
ভেবো না আমার সুখ দুঃখের লালায় তোমায় জড়িয়ে ফেলতে চাই
বিশ্ব আমার তোমায় ঘিরে
হীরে মুক্ত, পথের মাটি—সবই আমি পুড়িয়ে করি ছাই

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

এই শেষ পরমায়ু

রোদ্দুরে বিঁধেছে চোখ, অন্ধ হয়ে বন্ধ ঘরে থাকা—

বৃক্ষের আসনে বসে পরমান্ন পাবো এই মোহে
কেটে গ্যালো এতোদিন,
কতোবার ঠিকানা বদল—
এখন তেমন কোনো চিহ্ন নেই,
শবানুগমন
এখন তেমন কোনো প্রবঞ্চনা
রচনা করে না ;

রূপ ও রূপোর জালে আত্মঘাতী গঙ্গাফড়িং
কখন হারালো পথ, ঠিকানা কখন তার বেমালুম নিরুদ্দিষ্ট হোলো,

এই শেষ পরমায়ু, এই সেই দ্রুতগামী যানের মতন
সুন্দর রমণী,—তার কটিবন্ধে মধুচন্দ্র-জ্বালা—
অথচ কলঙ্ক তবু মেঘমালা হয়ে ঝরে বাতাবর্তে
অপলক প্রজাপতি ছুঁয়ে।

ময়দানে মলিন ছায়া, এখানে রোদ্দুর নেই, তাই
রোদ্দুরে বিঁধেছে হাত, পঙ্গু হয়ে শূন্যে ঝুলে থাকা—

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

কি লিখছ তুমি এত ?

কি লিখছ তুমি এত ?

কাজের ফাঁকে কথা বলার সময় কই,
অজস্র কথা জমে আছে বুকে।
সেগুলো না লিখলে মাথার ভেতর,
মাথা কুটে মরে,
লিখে ফেলে একটু হাল্কা হই।
দুরন্ত বেগে সময় ছুটে চলেছে,
আজ দশ, কাল ত্রিশ, পরশু বুড়ো,
দেখতে দেখতে এসে যায় মৃত্যুর সনদ।
প্রমাণ রাখতে হবে আমি এসেছিলাম।
তাই এত লেখা, এত কাজ, এত কিছু,
পৃথিবীর বুকে নাম খোদাই করা,
আমি এসেছিলাম, এসেছিলাম, এসেছিলাম।
আমারও কিছু দেবার জানাবার আছে।
এইটুকুই শুধু লিখছি হাজার হাজার কথায়,
কেউ বিজ্ঞানে, কেউ ছবিতে, কেউ কবিতায়,
কেউ যুদ্ধ করে, কেউ প্রেমে,
লিখে গেছে নিজেদের ঋথা,
সেই কথাই জীবনের মোড়কে বারবার অদলবদল করে
কোনপথে যাব ?

রজতশুভ্র গুপ্ত

আয়না ক্ষমাহীনা

আয়নাকে নিয়ে লেখা হয়না
বড় বেশী দাগ ওতো মেচেতা
সময়ের অবাঞ্ছিত ঝুলে পড়া
নিষ্ঠুর সাক্ষর···ক্লান্তি, ক্ষমাহীনা
দুরন্ত আবির্ভাব বড়ই নিষ্ঠুরা !

ওকে নিয়ে কিছুই লিখবো না
বরং শান্ত হলে রাতে, আয়না
ঘুমোবে, ওকে জাগাবো না !

সুনীল শর্মাচার্য

প্রযত্নে : ত্রিশ রামেন রোড

সেদিন টেলিফোনে তোমার কণ্ঠ আরও বেশী
মানবিক মোলায়েম রহস্যেটহস্যে ভরা মনে হলো
কি আশ্চর্য—
বাক্যের কোঠারে কোঠারে তুমি পাঠালে
অবিকল কথাডালা
ঘন কালো তারের প্রবাহে।

ঘড়িতে একটা বিশ। বাইরে তখন
পৌষের শীতের হাওয়ায়
কাঁপছে তিরতির রোদ্দুর। কখনো
অভিমানে, কখনো অনুরাগে
তোমার কণ্ঠ
আরো ও বেশী কেঁপে কেঁপে
যেন ওঠে····

হ্যালো কে বলতেই রিসিভারে তুমি
তুমুল হাসির ঢেউ তুলে বললে :
আজ্ঞে মশায়, চিনতে কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?
আমি কুমারীকা বোস,
প্রযত্নে : ত্রিশ রামেন রোড, কলকাতা—সাতাস।

সুব্রত রুদ্র

ভিক্ষা ও মৃত্যুর কাছে

মৃত্যুর কাছে একা যেয়ো না
—কেন যাই, দেখে নিই
কি সুন্দর শিশুর মতো, তাড়িয়ে দেবে না
—চেনা চেনা হাতছানি, দেখে নিই ?

মৃত্যু কাছাকাছি আসে বেশি ভালোবাসে আমাকে
বাঁচবো না, বাঁচবো না, আমাকে চায় মৃত্যুর অসুখ

দরিদ্র হয়েছি আরো দরিদ্র হবো।
ভিক্ষা বড়ো ব্যথা দেয়, লাঞ্ছনা অপমান দেয়
তবু যাই, যেতে হয় বলে
শব্দ আমার, শব্দ আমার ভিক্ষা ও মৃত্যুর কাছে···

রায়হান রাহমান

কাউকেই ছোঁব না

কাউকেই ছোঁব না, কবো না কথা
সমস্ত শূন্যের দুঃখ সাজিয়ে বানাবো
মস্তকহীন কাঠুরিয়ার এ্যাকুরিয়াম
ছুঁড়ে দেবো বৃক্ষহীন শত্রুর পিরামিড

কাউকেই ছোঁব না, চোখের চাউনি ফিরিয়ে নেবো
সাঁতার মানে তো নাভীর নিচের কাকচক্ষু
স্বপ্নহীন বিজন রাতের ক্রয় করা তুলসী পাহাড়
লজ্জাবতীর দুমড়ে পড়া বরফ কুচি ভিন্ন সুখ

কাউকেই ছোঁব না, এমন কি মরুদ্যানের এঁটো ভাত
দুই প্রহরীর মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে থাকা শিল্পীত ভুবন
শকুনে খেয়ে যাবে ? যাক না খেয়ে, কেমন করে
খেয়ে যায়, কেমন করে সাজায় আবার
ক্রীতদাসের যুগল ভ্রূণ ? দেখবো আমি, দেখবো···

কাউকেই ছোঁব না—কেউ যদি না বলে
পালের কাপড় তোলাই আছে ভাসাও তরী···

কেদার ভাদুড়ী

স্নান

তোমার তির্যক রশ্মি যতদূর যায়
ততদূরে যেতে পারি আমি।
তোমার সম্যক স্থিতি এখনো আবহ।
গত জনমের জননীও
এই যদি তুমি
আমার কটাহ ছেড়ে অগ্নিতে স্ফুলিঙ্গ হ'তে গিয়ে
হৃদয়ে মকর রাশি দিব্য ডিম পাড়ে,
একটি ভেঙে স্বর্গসিন্ধু, অন্যটিও উহার ভিতরে
সত্যি স্নান করে।

ছবি : কোজাগরী রাতের চন্দন দীঘি

কুয়াশা নামে সপসপ
যেন প্রেমের লুকোনো গুঞ্জন, ফিসফিস
গাছের প্রতিটি পাতা থেকে নামে পরকীয়া হাসি
আজ শুধু টুপটাপ শিশিরের জল, কান্না।
ঠিক তখনই ঘ্রাণ ছুঁয়ে যায় কেয়ার সুবাস
কোজাগরী পূর্ণিমারাতে কে বাজায় মাদল !
মন কি হারায় নি আজ মহুয়ার টানে ?
সারারাত জেগে আছে পৃথিবী লক্ষ্মীর আশায়
আর, নিত্য-অভিসারে অভ্যস্ত আঁকুপাঁকু প্রেমিকা
কপালে জমায় প্রেমার্ত ঘাম···
বিবিধ ক্ষুধায় আন্দোলিত চন্দনদীঘি
যার চতুরে জেগে আছে সবাই—
চুরির নারকেল স্তূপে মাতালের গড়াগড়ি, অসামঞ্জস্য সংলাপ
তবু আজ অভ্যস্ত চন্দনদীঘি প্রেমের কাঙাল,
সে পরকীয়া হাসি কোথায় !
আগামী ফাল্গুনে স্বকীয়া বাঁধনে যার বরণ হবে মরণ ?
এখনও কে বাজায় মাদল, বিরহের ঘাম কি মাদলে শুকোনো যায় ?

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

দাঁড়কাক

হাসনুহানা রোদ ছিল, তবু তার অনটন, বনজ জিজ্ঞাসা।
কুয়াশা ঠেলেছে ঢের, মানুষের গল্প গেছে থেমে।
নদীর নাব্যতা নেই, সুবচনী নারী নেই, ডিঙ্গি নৌকোয়
বসেছে দাঁড়কাক। পাখনায় ক্লান্তি, মৃদু ভয়।
ওড়ার সামর্থ ছিল, তবু তার অনটন, বনজ জিজ্ঞাসা।

ওয়াজেদ আলি

গত বুধবার 'এ্যমি' চলে গেল

গত বুধবার 'এ্যমি' চলে গেল
বটতলার ছায়াপথ ধ'রে
আলোর সমুদ্রে
আমাদের বাড়ীর দক্ষিণে
সেই খাল
ঐ খালের পুল থেকে জলে…
জলের অমোঘ কোলে
'এ্যমি' চলে গেল

এখন আমার চারপাশে ভীষণ শূন্যতা
শূন্যতায় ছেয়ে আছে
সারাটা ভুবন
মৌসুমি মনের মাঝে
তাই সেই অন্ধরাত কাঁদে
আর একা একা বার বার গাঢ় কুয়াশায়
শুধু তার জ্যোৎস্নামুখ ফোটে

দীপক কর

এখানে এসো না

এখানে শুধু শোক
শোকের মূর্ছনা
দূরে আছো ভালো আছো
এখানে এসো না।

এখানে দীর্ঘরাত
নক্ষত্রের ক্রন্দন

ফাগুন আসে না
কেবল গ্রীষ্মের দহন।

দূরে আছো ভালোই আছো
কেন আসতে চাও?
দুঃখ ভালোবাসো?
—শিক্ষের পাঠ নাও।

নির্মল তেওয়ারী

শুধু তুমি বন্দনা

এই চোখ বয়ে যায় অন্তরালে অকৃপণ ঢেউ
কোথা যায়? নদী থেকে সাগরে কোথাও
এইসব দেখে একা একা চন্দ্রমল্লিকা ফোটে
জীর্ণ বাগানে, শ্রাবণ সন্ধ্যায় বুঝি অশান্ত বৃষ্টিপাতে
নির্মল আকাশ নিয়ে ভিজেছে হৃদয়,
শুধু তুমি বন্দনা
আজীবন বেঁচে থাক এই বুকে
নিঃসঙ্গ অনুভবে॥

অরুণাভ ভৌমিক

শব্দ

যে আমাকে দেবে দ্যুতিময় শব্দ সন্ধান
আমি তার আজন্ম ক্রীতদাস
শব্দ তো শব্দ নয়, শব্দ হিরণ্ময়

তাকে আমি জড়িয়ে শুই, উপভোগ করি
রাখি মাটীতে
ছড়িয়ে দিই বাতাসে
অন্ধকারে, অরূপ-প্রবাসে

সে আমাকে বলে
শান্ত হও। রূপান্তরিত
যেন তাকে ভালবেসে অপমান করেছি সীমাহীন।

শংকরজ্যোতি দেব

ভোর শেষের বেলা

ভোর শেষের বেলা ঐ সহেলী বালক
কীটদগ্ধ করতল তুলে
গেরস্থের উঠোন ছায়ায় এসে দাঁড়ায়
কচি মুরতো বনের দধিচ চিহ্ন নিয়ে
দিনকানা বাপ, নদীর কপাট পরা বুক
স্বাধীন ছত্রের পাথুরে ভয়
পাষাণ কংকাল, কোন শখের একতারা তুই ?
শেষের কোকিল বুঝি ফেলে যায়
রাজন্য হাসনের ভ্যাটিয়াল চাঁদ

একদিন সুরমার উজান বেয়ে চিরলণ্ঠন
সিটি দিয়ে যেত দিগন্ত দ্রাক্ষার সোঁদেলা ঘ্রাণ

সৈয়দ কওসর জামাল

ভিক্ষুক

কেমন চন্নছাড়ার মতো মুখ
রুক্ষ চিবুক, আর কালিপড়া চোখে
চেয়েছি তোমাদের দিকে—
যেন কতকাল পাশে বসেনি কেউ
কতোকাল আত্মীয়ের মতো কথাও বলেনি কেউ ;

তাই দিনমান এই ভিক্ষুকের মতো দ্বারে দ্বারে ঘুরি
তারপর ভিক্ষান্ন বলে যা কিছু হাতে উঠে আসে,
গোগ্রাসে গিলি, পরান্নের মতো

এই তো অনেক—এখনো লোলুপ চোখে
তাকাও ওদিকে ? ভাবতেই খাঁ খাঁ করে ওঠে বুক
এ পরান্নে সুবাস দিয়েছো ?

কথা নেই কেন ? রাগ, অভিমান ?
উত্তর নেই কোন।
শুধুই নির্লিপ্ত চোখ চেয়ে থাকে এইদিকে।

তারপর দরোজা বন্ধের শব্দ এসে শীতলতা ভাঙে
আমিও এগোই—অন্য পথে, অন্য দ্বারে।

নীতিশ বসু

পেনসিলে আঁকা মাঠ

আমি গিয়েছিলাম একদিন অমিতাভের 'পেনসিলে আঁকা মাঠে'
পাখি বলতে ঝাঁক ঝাঁক শকুন কাক চিল বক···
মানুষ ছিলো না একটাও
দেখেছিলাম আকাশ নীল মাটি আর ছিলো
গাছগাছালির নদীনালা পাহাড়।
মুখে থু থু উঠেছিলো হাঁটতে হাঁটতে সেদিন

সেই 'পেনসিলে আঁকা মাঠে' আমার এখন ঘর হয়েছে
অমিতাভের ঠিক পাশেই।

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

জানাজানি

সুস্থ নয় যে যার অসুখে আছে
ভালো। আমি আর যাবো না শুধুই
জলস্রোতে—জলজানে সেই কথা

শুধু যা মুরলী বলে বীন নাচে
ভালো। আহারে, হৃদয় নাচে না
প্রেমে—প্রেম জানে সেই কথা

নূতন বালক বা শ্রমিকেরা বাঁচে
বেলফুল কিনে ক্লান্ত বাড়ী ফিরে যায়
ভালো,—ভালো কি জেনেছে সেই কথা

মাঠ যায়, আমার চিতায় দিও মৌচাক
ঈশ্বর! করাতে কেটেছে হাত তাই কবিতা লিখি না।

কবিকে বোলো—বলো না সেই কথা

মালিনী তুমিও তাই রেখো কুঁচফল—বিষলতা॥

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

আদিম কিংশুক ফোটে

গাব্বে হাউস থেকে ছাড়া পেয়ে
বেবুনটা লাফিয়ে উঠলো গিয়ে
রাইটার্সে'র মাথায়
চোখে হাত ঠেকিয়ে কিছু ঠাহর না পেয়ে
আবার মনুমেণ্ট থুড়ি শহীদ মিনারের চুড়োয়…
কি চায় ভদ্রলোকটি…ও মশাই কি দেখছেন…
[ডারউইন সাহেব জিন্দাবাদ]
সংসদ ভবন লোকসভা স্কাইস্ক্র্যাপার ছাড়িয়ে
অনন্ত গাছগাছালির অন্ধকার
সেখানে আদিম কিংশুক ফুটে আছে
থরে থরে
এ পৃথিবী ও পৃথিবী অন্য পৃথিবীর
ঘরে দোরে…

রথীন্দ্রনাথ রায়

আলপিন নেই যে তুমি ঝুলে থাকবে

ইচ্ছে করে তোমাকে ভেঙে দিই
বিভাজন রেখা টেনে বলি ঃ
আর একপাও এদিকে নয়, মাদাম
এখানে আকাশ ভেঙে গেছে

ফুটিফাটা বুক
এমন আলমারী রাখিনি
যে একটা ডল রাখবে
ফ্রিজ না, টি, ভি, না
এই একমাত্র মিটসেফ কবুতর
আর চাঙড়খানা খুপরি

তুমি দিবযামায় দ্যাখো নীল স্বপ্ন ?
প্যারাম্বুলেটর নিয়ে ঘুরে আসো তিন মাইল
তোমার অংঘ্রিতে বেজে ওঠে
নূপুর নিক্কণ
তুমি স্থথ, তুমি চন্দ্রাতপ মাথা বেলফুল
তুমি মৌনাবতি
আমি পলেস্তরাখসা দেয়াল
দেয়ালের গায়ে কোন আলপিন নেই
যে তুমি ঝুলে থাকবে।

নন্দলাল সেনগুপ্ত

'প্রেম—অন্য কিছু'

ফুল ঝরে যায় না
শুধু মাটির একান্ত প্রেমে ধরা দেয়।
একান্ত আবেগও বুঝি ভাষাহীন
কাছে এলে শান্ত মৌন, দুর্বার দুরত্বে
বেদনা আকাশ নয়, শুধু কালো মেঘ
পণ্য নয়—এই প্রেম আরো অন্য কিছু
হৃদয় ভরে না তবু পিপাসা অসীম।

সৈয়দ হাসমত জালাল

এসো প্রেম

অন্ধকার করতলে ধরেছো যুবকের অশ্রু ও ঘাম
এখন ঈষৎ সাহসিনী হওয়া ভালো
বহু জীবনের প্রেম, তোমাকে সে কোন্ সংজ্ঞায় বাঁধি
প্রামাণ্য নও

মরা ঝরা পাতার আড়াল থেকে পাখির শিসের মতো
ঘুরে ফিরে নেমে আসো হৃদয়ের নরম মাটিতে
যেখানে রক্ত ঝরেছে যুবকের দুচোখের মণি বেয়ে
যেখানে থমকে দাঁড়ায় এসে শস্য সম্ভব দিন
অনশনরত শ্রমিকের হাতে অস্ত্রের রূপে জেগে থাকে ক্ষুধা

এসো প্রেম, অন্ধকারে, যেভাবে রেখেছো মাথা যুবকের বুকে
যেভাবে তোমার গভীর চুলে ডুবে যায় শস্যগন্ধ
আমাদের বহু রাত্রির ঘুম
এবার নিজেকে খোলো, গোধূলি আলোয় দ্যাখো পুড়েছে পৃথিবী
বুকের পাঁজর ভেঙে ছুটে গেছে পথ আর শীতের বাতাস
এখন ঈষৎ সাহসিনী হওয়া ভালো

এসো প্রেম, পরুষ রক্তাক্ত ঠোঁটে আরো একবার তোমাকে চুম্বন করি

কৃষ্ণ নন্দী

অপেক্ষা

এখন পশ্চিমে গেছে বায়ু জল, এদিকে রোদ্দুর
এদিকে কাজল
ধুয়ে মুছে গেছে সবই, বিবর্ণ পাতাও ভূমিতলে
পুজো দেবো মনসার বৃষ্টি তুমি ফোঁটা দাও
ভ্রূ-মধ্য-কপালে
চন্দনের কৌটো থেকে
এঁকে বেঁকে অভিমানে মেঠোপথ কতদিন আগে চলে গেছে
পশ্চিমের ঘর
হৃদয়ের ভিতরে ভিতর
বড় ফাঁকা
এখানে রোদ্দুর, ছায়া নেই

এইভাবে কতদিন বাঁচে হৃদয়ের কোমল কুসুম ?
দুচোখের অপেক্ষায় জেগে আছে পরিপূর্ণ ঘুম

মধ্য দুপুরে

চতুর্দিকে মধ্য দুপুরে
কারা স্নান করে যাচ্ছে কাদের পুকুরে !
এইটুকু মাত্র সময়
সুতরাং হেলাফেলা নয়
এই বেলা সব ছেড়ে ছুড়ে

এই ঘাটে ডুব দাও মধ্য দুপুরে ॥

বীরেন সাহা

প্রতীক্ষায় থাকি

আকাশে স্তব্ধ মেঘ, তবু ওড়ে হাওয়াই জাহাজ
নীলের বিভ্রমটুকু অন্ধকারে থাক—
তাকে নিয়ে আজ বড় বিব্রত ;
নক্ষত্রের ঘরে কম্পমান পিলসুজ
হেমন্তের পথে প্রতীক্ষায় জ্বলে টিমটিম
সে আমারই একান্ত দোসর,
সন্ধ্যা-লীন তটরেখা হারালে শালিখ
নিষ্পাপ ডানা তার কণ্ঠে হাসে কাঁদে।

কেউ কেউ অন্ধকারে পাঁজি দেখে
নৈশ ট্রাকে অবিচল ঘোরে কেউ কেউ
বালির পাহাড় থেকে কেউ খুঁড়ে নেয় সুখ,
বহুদূরে কলঘর শান্ত হলে
আমি সিক্ত-ম্লান পথে সন্তর্পণে হাঁটি

প্রহরের ক্ষেতে অজস্মান ঝোপ,
মরা ঘাসে জলবিন্দু পায় না চরণ
মধ্যরাতে ঘরে ফেরে বিজয়ী নাবিক
মৃত এই নগরীর তারাই স্বজন,
বেগুনী বিন্দুর দিকে আমি প্রতীক্ষায় থাকি
আমি একা অভিযাত্রী—আমি একা।

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

সর্তহীন মিল ছিল

যখন শব্দের সঙ্গে সর্তহীন মিল ছিল ঘরে
মনে হত শব্দ আর শব্দের ঈশ্বর
অবিচ্ছিন্ন একাকার
আশ্চিক্য নিবিড় ছিল সহবাসে, অথচ এখন
ফাটা মেঘে শুধুই আপোষ : তিব্বতের জাল ছিঁড়ে
মানসের উড়ে আসছে হাঁস ; খোঁড়া গর্তে
কলকাতার বাঁ-কাঁধে পচন, খোঁড়া গর্তে
লোহা-লক্কড়ের জল লাল হয়ে ভাসে, বহুদিন
হয়ে গেল—মুলে যেতে চেয়েছিল চোখ
এখন অন্ধের মত
ঝুমঝুমির শব্দ শুনে কাটাচ্ছে সময়
দিন যায়, কাঁটাগাছে সাপ হাঁটে, ঈশ্বরের ছেঁড়া বই
তাড়াচ্ছে বাতাস।

বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়

স্মৃতিচারণ

শব্দের সিঁড়ি কিংবা তন্তু জাল দিন বদলের পালা কিংবা
প্রত্যুষের সোনাঝরা রোদ, বিন্দু বিন্দু অনুভূতি চন্দনকাঠের
সিঁড়িতে সারিবদ্ধ সুশৃংখল মধ্য যৌবনে শোনা যায়
মধ্য সমুদ্রের আদিম নৌযানের শংখধ্বনি, শস্যের গন্ধের
নীচে জমে থাকা মায়াময় সভ্যতা। এসব জিনিস
হয়তো মনভুবুরির আহরণ নয়—তবু অবিকল মানুষের
দু-একটা স্বপ্নের মতো অভিমানী স্মৃতির ঘেরাটোপ,
ভালোবাসার কাছে নতজানু হয়তো সব সময়েই হওয়া যায় উতরোল
রক্তিম হাওয়ার মাঝে, অনেক অনেক শিউলী ফুল
ফুটেছিল একদিন—আর তারই স্মৃতিচারণ করতে
গিয়ে আজ আমার শরীর ও মন বিষণ্ণ, ক্রমশ।
এভাবেই আমি হেঁটে যাচ্ছি গাঢ় সময় থেকে ধূসর
কুয়াশার ভিতরে।

অপরাজিতা গোপ্পী

সময় আসন্ন

বন্ধু সময় আসন্ন
ঝড়ের সংকেত প্রকৃতির
আকাশে বাতাসে
এবার কবরের মুখ খুলে
দ্বিতীয় আগুনে—মশাল জেলে
এসো, একসঙ্গে লৌহকপাটের
সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

প্রবীর ঘোষ রায়

প্রশ্রয়

বালক জানে না ছল,
স্তুতির আড়ালে উপহাস-জানে না বালিকা।
শৈশবের কাছে তাই বাজীকর প্রশ্রয় খোঁজে,

'বাচ্চেলোগ্ ফির একবার তালি বাজাও···
ডুগ্-ডুগ্ ডুগ্-ডুগ্ গাঢ় কুয়াশায়
ডুব দেয় মধ্যবয়স।

সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য

রামকিংকর স্মরণে

অবন ঠাকুর রঙিন পোটো
গগন গাঁথেন সিঁড়ি
রামকিংকর মহুয়া-রসে
বসেন আসন পিঁড়ি।
যামিনী রায় চোখের বিভায়,
নন্দলালের পুজো
মূর্তি জুড়ে বাজলে মাদল
রামকিংকর খুঁজো।

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

কথা

কথার বাগানে বহুদিন হেঁটে গেছি
পায়রার চোখে চিনেছি অশোকতরু
বিষাদ মানিনি দুঃখের স্রোতে ভেসে
সরস থেকেছে হৃদয়ের ধু ধু মরু

কথা মানে বোধ অন্তরঙ্গ বোধি
কথা মানে প্রাণ শব্দের নীরাজন
কথা মানে রোদ আলোকের প্রতিভাস
কথা মানে প্রেম প্রকৃতির স্পন্দন

সেই কথা খুঁজি স্বপ্নে ও জাগরণে
যে দেবে আমাকে মানুষের করতল
পৃথিবীর ঘাটে নৌকো ভেড়াবে মাঝি
প্রেমকে নামিয়ে বলবো : তু বাড়ি চল্ ॥

তাপস ভট্টাচার্য

সময় নেই আমার

ধাষ্টামো কোরো না, ছাড়ো এখন
বিয়োবার সময় নেই—
মাঠে ছাড়া গরু
উঠোনে ধান,
তুলতে হবে গুছিয়ে, কুড়িয়ে-কাছিয়ে
গোলা আর শূন্য রবে না।
বানভাসি-খরা—
ক্ষুধার্ত রবে না কেউ।
এমন নিশ্চয়তার কথা ভেবে
ধাষ্টামো কোরো না আর, ছাড়ো এখন
বিয়োবার সময় নেই আমার।

বিদেশী কবিতা

ফিলিপিন্স

সুলতান জামালুল কিরাম-তৃতীয়

[কবির নাম সুলতান জামালুল কিরাম তৃতীয়। এই কবি ফিলিপিন্সের দক্ষিণ অঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত সুলু দ্বীপের সুলতান। মাত্র ৪৭ বৎসর বয়স্ক "তান-সান" উপজাতীয় ধর্মপ্রাণ নেতা। বহু কবিতা ও গানের স্রষ্টা। এখানে গৃহীত কবিতাটি "ইমপ্যাক্ট", ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সংখ্যা প্রথম প্রকাশিত হয় ফিলিপিন্সের ম্যানিলায়।]

আমি জানি,
আমিও ঈশ্বর খুঁজে বেড়াচ্ছি
তাঁর কথা শোনার,
অধীর অপেক্ষায় প্রত্যহ।

একজন নেতা সবার কথা শুনবে
জনগণের পরামর্শ
বিশেষতঃ যারা
সমাজের নীচু-তলার!
এভাবেই ঈশ্বরের সকল কথাই
শোনা সম্ভব।

অনুবাদক : অমিতাভ চক্রবর্তী

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে

মারাঠী

মৃণালিনী কেলকার

[জন্ম ঃ ১৯৪৭ নাগপুর। ১৯৬৫ থেকে কলকাতায়। মাতৃভাষা মারাঠী। নিজের মাতৃভাষায় গল্প উপন্যাস লেখে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিচিতি পেয়েছেন। মারাঠী ছাড়া হিন্দী, বাংলা, ইংরাজীতে লিখতে পড়তে পারেন। বহু বাংলা গল্প, উপন্যাস অনুবাদ করেছেন।]

ব্যাজস্তুতি

হাজার হাজার মানুষকে ঘরছাড়া করে ; অনাহারে রেখে
চারপাশে বড় বড় ঘরবাড়ী
ক্রমশই আকাশের দিকে।
কে জানে এই সব গগনচুম্বী
অট্টালিকা তৈরী করতে অপরিচিত
হাজার হাজার মানুষ হয়েছে শহীদ।
অট্টালিকার মালিকেরা কিন্তু
তাদের কথা মনে রাখে নি।
মনে রাখে নি গৃহহারাদের কথা
ওদের আশ্রয় এখন ফুটপাত।
ওপথেই ওদের ঘর সংসার।
অবহেলায় অসহায় ভাবে
ওদের দিনরাত্রি শেষ হচ্ছে।
পাশাপাশি বড়লোকেরা
হোটেলে লাস্যময়ী নারীদের
নিয়ে স্ফূর্তির ফোয়ারায়।
গৃহহারাদের কথা
কে আর মনে রাখে ?

অনুবাদ ঃ জীবন সরকার

● বিশেষ আলোয়

হরপ্রসাদ মিত্র প্রতিষ্ঠিত কবি। অনেক কাব্যগ্রন্থ আছে তাঁর। এবং তিনি একজন প্রথিতযশা অধ্যাপক।

কবিতার নানাবিধ ফর্ম তাঁর আয়ত্তে। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ। ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৭৯ মধ্যে রচিত তাঁর কবিতাবলী এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। অর্থাৎ এই গ্রন্থের রচনাগুলি তাঁর বারো বছরের ফসল। তাঁর জীবনের এক যুগের কাহিনী।

মেঘকে রাখবে ধ'রে—তাই কি পাহাড়
আকাশে তুলেছে আপনাকে ?

তাঁর 'গুঞ্জন' শীর্ষক কবিতার এই দুটি ছত্র আমাদের মনকে আকর্ষণ করেছে। এবং মনে হয়েছে, তাঁর কবিতার মেজাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও মানসিক উত্তরণ ঘটেছে।

মানুষের জীবন আসলে পর্যটন ছাড়া কিছু না। এই বইয়ে হরপ্রসাদকে আমরা অনেকটা পর্যটকরূপে পেয়েছি। জীবনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একত্র হয়ে এখানে উপস্থিত। অনেক ঘুরেছেন তিনি, অনেক দেখেছেন। ঘোরে তো কত লোকই, দেখে তো কত মানুষই। সেই ঘোরা এবং সেই দেখা মানুষকে কতটা সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছেন হরপ্রসাদ।

এই বইয়ের কবিতাবলীর বেশির ভাগই বর্ণনাধর্মী। সে সব বর্ণনা কাব্যময় তো বটেই, চিত্ত-চমৎকারীও।

যেন এ জীবন জুড়ে বাসনারা বন-উপবন
কুসুমিত কেউ-কেউ, অনেকেই নিষ্ফল, নিষ্ফল।

'কুঁয়ারিয়া গ্রাম' শীর্ষক কবিতায় তিনি এ কথা বলেছেন। একথা কবির তো বটেই, এ কথা দার্শনিকেরও—যিনি জীবনকে মন্থন ক'রে-ক'রে জীবনের দর্শন পেয়েছেন।

মোট ৮৭টি কবিতা আছে এই বইয়ে। অনেক তীর্থের কথা আছে এতে, আছে অনেক মনোরম স্থানের বর্ণনা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবিতাই যে সর্বতীর্থসার, হরপ্রসাদের এই গ্রন্থটি পাঠ করে তাঁর এই উপলব্ধির কথাটাই বার-বার মনে হল।

—সুশীল রায়

ইদানিং আমি। হরপ্রসাদ মিত্র। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩। দশ টাকা।

২

একদা বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখতেন বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা ও গ্রন্থাগারের দায়িত্ব বহনে ব্যাপৃত থাকায় কলকাতার আধুনিক কাব্যধারা থেকে তিনি কিছুটা বিযুক্ত। তাছাড়া শুধু কাব্যে নয়, ছোট গল্প, প্রবন্ধ এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের আলোচনামূলক গ্রন্থ রচনাতে ব্যস্ত থাকার জন্যও হয়ত তিনি কবিরূপে আত্মপ্রকাশ ও প্রচারের ব্যাপারে কিছুটা উদাসীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে তাঁর যে কাব্যসংকলনগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্য দিয়েই তাঁর কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত। 'মনঝাউ'-এর কবিতাগুলিতে নিসর্গ-প্রেমিক উদাস কবিচিত্তার যেমন প্রকাশ 'কাঠের কেল্লা থেকে প্রান্তিক তারায়' তেমনি তাঁর পর্যটক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অনুভব। সম্প্রতি প্রকাশিত 'সাবেরি' তাঁর আর একটি কাব্য সংকলন যার মধ্যে এক নির্জন কবির দেখা পাওয়া গেল।

'প্রকৃতির আলপনা আঁকা দিনাঙ্গনে
বেজে ওঠে সাবেরি রাগিনী'

'সাবেরি' সন্ধ্যার রাগিনী। শব্দ ও ভাবকে সুরের তন্ময়তায় অনুভবে গভীর করে তুলেছেন কবি। প্রথম কবিতাটিতেই সেই শব্দময় ভাবব্যঞ্জনার প্রকাশ ঃ

'শব্দের স্পন্দন শোনো
গানে কিম্বা ধ্যানে'

গানের সঙ্গে ধ্যান একাত্ম ; শব্দ তার চারপাশে সৃষ্টি করে স্থিতির ব্যঞ্জনা। যেমন—

'এস্রাজে সুর তুললেই মনে পড়ে
শান্তিনিকেতনের উচ্চারিত শালবীথি'

কবির মনে সুরের এই ধ্যান শব্দের মাধ্যমে যে পরিবেশ তৈরী করেছে তার থেকে উচ্চারিত কবিতাগুলির গ্রন্থবন্ধ নাম 'সাবেরি'। 'সাবেরি'র করুণ নির্জন ধ্যানই প্রতিধ্বনিত কবিতাগুলির ছত্রে-ছত্রে। তাঁর অনুভব ব্যথায় করুণ কারুণ অতৃপ্তির বেদনা তাঁর হৃদয়ে—

'সহস্র ধারায় করে প্রেম তবু তৃষ্ণা থেকে যায়'

কবির স্বীকৃতি ধরা পড়েছে তাঁর কবিতাতেই ঃ

'আমাকে যেটুকু দেখ সে শুধু কাঠামো
আগুন জমিয়ে রাখি বুকে।'

বীরেনবাবুর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'মৃদঙ্গে মিড়' সবেমাত্র হাতে এসে পৌঁছেছে। ভবিষ্যতে গ্রন্থটির সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

—সন্তোষকুমার অধিকারী

সাবেরি। বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৭৩। প্রচ্ছদচিত্র রামকিঙ্কর। বাহাত্তর পৃষ্ঠা, মূল্য ঃ ছয় টাকা।

৩

জীবন সরকারের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের। ছোট গল্পের একজন উৎকৃষ্ট ও দরদী লেখক হিসেবে। জীবনের অনেক গল্পই অনবদ্য এবং জীবনেরই গল্প। গল্পকার জীবন কবিতাও লেখেন জানি তবে তা গল্প লেখার অবসরে অনুষঙ্গ হিসেবেই। তাঁর কবিতা ইতস্তত পড়বার সুযোগও মাঝে মাঝে আমার হয়েছে। কাব্যগ্রন্থ যদিও তাঁর এইটিই প্রথম। কাব্যগ্রন্থটি হাতে পেয়ে কবি জীবনকে আমি নতুন করে খুঁজে পেলাম। মনে হল জীবন সমসাময়িক অনেক কবির চেয়েই অনেক ভালো কবিতা লেখেন। অর্থাৎ তিনি গল্পকার না হয়ে "প্রচলিত অর্থে" কেবলমাত্র কবিও হতে পারতেন অনায়াসেই। অথবা আরো ভালো করে বলতে গেলে আসলে জীবন সরকার কবিই। তাঁর মানসিকতা আদি এবং অকৃত্রিম কবি মানসিকতা। তাঁর গল্পের ভেতরও তাই কবি জীবন সরকারকেই দেখতে পাওয়া যায় মুখ্য ভূমিকায়। অবশ্য আড়াল থেকে।

"এই আলোয় এই হাওয়ায়" জীবন সেই আড়াল থেকে সামনে এগিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এই পৃথিবীর আলো আর হাওয়া চোখ এবং বুক ভরে নিয়ে যখন তিনি উচ্চারণ করেন—"ধানক্ষেতের ঢেউ ভাঙলে ঠাণ্ডা হাওয়া/ফুলোনো শীষের মাথায় এলোপাথালি চলে যায়" [কেউ সাড়া দেয় না], পাঠকের চোখে-মুখে বুকেও সেই ঠাণ্ডা হাওয়ার ঢেউ এসেই লাগে। স্নিগ্ধতার আমেজে প্রাণ মন ভরে যায়। ফুটিফাটা গ্রীষ্মের মাঠে প্রথম বৃষ্টির মাতামাতি, উথাল-পাথাল। অতি চেনা মিষ্টি সোঁদা গন্ধে